# লঘুগুরু

# লঘুগুরু

## প্রবন্ধাবলী

রাজশেখর বসু

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৪৬

মূল্য এক টাকা

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

# সূচী

# নামতত্ত্ব

হরিনাম নয়, সাধারণ বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের নামের কথা বলিতেছি।

কবি যাহাই বলুন, নাম নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। পুত্রকন্যার নামকরণের সময় অনেকেই মাথা ঘামাইয়া থাকেন। অতএব নাম লইয়া একটু আলোচনা করা নিরর্থক হইবে না।

প্রথম প্রশ্ন—বাঙালীর সংক্ষিপ্ত নাম কিরকম হওয়া উচিত। মিস্টার ব্রাউনের নকলে মিস্টার ব্যানার্জি চলিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক হাজার আছেন। এত বড় গোষ্ঠীর প্রত্যেকে যদি মিস্টার ব্যানার্জি হইতে চান তবে লোক চেনা মুশকিল। বিলাতী প্রথার অন্ধ অনুকরণে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে বা অন্তরঙ্গগণের মধ্যে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলিতে পারে, কারণ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে লোক চেনা সহজ। কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে বাঁড়ুজ্যে বলিলে ব্যক্তিবিশেষ বোঝায়

না। সুরেন্দ্রবাবু বরং ভাল। সুরেন্দ্রের সংখ্যা অনেক হইলেও বোধ হয় বাঁড়ুজ্যের সংখ্যা অপেক্ষা কম। যদি নামের বিশেষ করা বাঞ্ছনীয় হয় তবে নামকরণের সময় সুরেন্দ্রের পরিবর্তে অন্য কোনও অসাধারণ নাম রাখা যাইতে পারে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশী রকম রূপান্তরিত করা অসম্ভব। বাঁড়ুজ্যে, ব্যানার্জি, বনারজি—বড় জোর বানরজি। সুরেন্দ্রবাবুতে অরুচি হইলে মিস্টার সুরেন্দ্র বা শ্রীযুত সুরেন্দ্র বা সুরেন্দ্রজী চলিতে পারে। কেউ হয়তো বলিবেন—বাপের নাম মিস্টার সুরেন্দ্র আর ছেলের নাম মিস্টার রমেশ, ইহা বড় বিসদৃশ; মিস্টার ব্রাউনের পুত্র মিস্টার ব্ল্যাক—এরকম বিলাতী নজির নাই। বাপের নাম বজায় রাখার উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু তাহা অন্য উপায়েও হইতে পারে। গুজরাট মহারাষ্ট্র মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করার রীতি আছে। বংশগত পদবীটা ছাড়িতে বলিতেছি না, পুরা নাম বলিবার সময় ব্যবহার করিতে পারেন। মিস্টার সুরেন্দ্র যদি স্বনামে জগদ্‌বিখ্যাত হন তবে বংশপরিচয় না দিলেও চলিবে। কালিদাস পাঁড়ে ছিলেন কি চৌবে ছিলেন, সক্রেটিস কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু সেজন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—নাম শ্রীযুক্ত না শ্রীহীন হইবে। এই জটিল বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। শ্রী-বিরোধী বলেন—শ্রী অর্থে ভাগ্যবান, নিজের নামে যোগ করিলে

সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ পায়; আর, অক্ষরটিও নিষ্প্রয়োজন বোঝা মাত্র। শ্রীর আদিম অর্থ যাহাই হোক সাধারণে এখন গতানুগতিক ভাবেই ব্যবহার করে, অতএব গর্বের অপবাদ নিতান্ত ভিত্তিহীন। যিনি অনাবশ্যক বোধে ভার কমাইতে চান তিনি শ্রী বর্জন করিতে পারেন। তবে অনেকে যেসব ভারী ভারী বোঝা নামের সঙ্গে যোগ করিবার জন্য লালায়িত তাহার তুলনায় শ্রীঅক্ষরটি নগণ্য।

তাহার পর সমস্যা নামের গঠন লইয়া। বাঙালী পুরুষের নাম প্রায় দুই শব্দ বিশিষ্ট, যথা—নরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্র-কৃষ্ণ। দুই শব্দ কি সমাসবদ্ধ না পৃথক্? ষষ্ঠীতৎপুরুষে নরেন্দ্রনাথ নিষ্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ রাজার রাজা। রাজেন্দ্রনাথও তদ্রূপ, অর্থাৎ রাজার রাজা তস্য রাজা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বোধ হয় দ্বন্দ্ব সমাস, অর্থাৎ ইনি নরেন্দ্রও বটেন কৃষ্ণও বটেন। নরেন্দ্র-লাল সংস্কৃত-ফারসীর খিচুড়ি, ভাবার্থ বোধ হয় নরেন্দ্র নামক দুলাল। নিবারণচন্দ্র বোঝা যায় না, হয়তো আন্নাকালীর পুংসংস্করণ। মোট কথা, লোকে ব্যাকরণ অভিধান দেখিয়া নাম রাখে না, শুনিতে ভাল হইলেই হইল। রাজা-মহারাজেরা গালভরা নাম চান, যথা জগদিন্দ্রনারায়ণ, ক্ষৌণীশচন্দ্র। কিন্তু তাঁহারা বিলাতী অভিজাতবর্গের তুলনায় অনেক অল্পে তুষ্ট। George Fitzpatrick Fitzgerald Marmaduke Baron Figgins—এরকম নাম এখনও এদেশে চলে নাই। উড়িষ্যায় আছে বটে—শ্রীনন্দনন্দন হরিচন্দন ভ্রমরবর রায়। সুখের

বিষয় আজকাল অনেক বাঙালী ছোটখাটো নাম পছন্দ করিতেছেন।

বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি। শরীরে আর্যরক্তের যতই অভাব থাকুক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বাঙালীর যত আছে অন্য জাতির বোধ হয় তত নাই। তথাপি অর্থবিভ্রাট অনেক দেখা যায়। মন্মথর পুত্র সন্মথ, শ্রীপতির পুত্র সাতকড়িপতি, তারাপদর ভাই হীরাপদ, রাজকৃষ্ণর ভাই ধিরাজকৃষ্ণ দুর্লভ নয়।

আর এক ভাবিবার বিষয়—নামের ব্যঞ্জনা বা connota*tion*। যেসকল নাম অনেক দিন হইতে চলিতেছে তাহা শুনিলে মনে কোনও রূপ ভাবের উদ্রেক হয় না। নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়লোক বা কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত সেজন্য অতি নিরীহ, কিন্তু মহিলামোহন শুনিলে lady killer মনে আসে। অনিলকুমার নাম বোধ হয় রামায়ণে নাই, সেজন্য ইহা এখন শৌখিন নাম রূপে গণ্য হইয়াছে, কিন্তু পবননন্দন নাম হইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দুরূহ। কালিদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কিন্তু কালীনন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে আসিবে রক্ষাকালীর বাচ্চা। অতএব নামকরণের সময় ভাবার্থের উপর একটু দৃষ্টি রাখা ভাল। আজকাল পুরুষের মোলায়েম নাম অতিমাত্রায় চলিতেছে। রমণী কামিনী সরোজ শিশির নলিনী গোলাপ অমিয় ইত্যাদি নাম পুরুষরা অনেক

দিন হইতে বেদখল করিয়াছেন, এখন আবার কুসুম মৃণাল জ্যোৎস্না লইয়া টানাটানি করিতেছেন। চলন হইয়া গেলে অবশ্য সকল নামেরই ব্যঞ্জনা লোপ পায়, কিন্তু কোমল নারী-জনোচিত নামের বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয় বাঙালী পিতামাতা পুত্রসন্তানকে কমলবিলাসী সুকুমার করিতে চান।

পুরুষের নাম একটু জবরদস্ত হইলেই ভাল হয়। ঘটোৎকচ বা খড়্‌গেশ্বর নাম রাখিতে বলি না, কিন্তু যাহা আমরণ নানা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা একটু টেকসই গরদখোর হওয়া দরকার। উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিস কোর্টে ওকালতি তাঁহার সাজে না।

মেয়েদের বেলা বোধ হয় এতটা ভাবিবার দরকার নাই। তাঁহারা সুরূপা কুরূপা বালিকা বৃদ্ধা যাহাই হোন, নামটা তাঁহাদের অঙ্গের অলংকার বা বেনারসী শাড়ির মতই সর্বাবস্থায় সহনীয়।

কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আর এক দিক হইতে কিছু ভাবিবার আছে। কিছুকাল পূর্বে এক মাসিক পত্রিকায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল

—মেমেদের যেমন নামের আগে মিস বা মিসিস যোগ হয় বাঙালী মহিলার নামে সেরূপ কিছু হইবে কিনা। অবিবাহিতা বাঙালী মেয়ের নামের আগে আজকাল কুমারী লেখা হয়, কিন্তু বিবাহিতার বিশেষণ দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে সধবাসূচক শ্রীমতী বা সৌভাগ্যবতী চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করি—কুমারী বা সধবা বা বিধবা সূচক বিশেষণের কিছুমাত্র দরকার আছে কি? পুরুষের বেলা তো না হইলেও চলে। স্ত্রীজাতি কি নিলামের মাল যে নামের সঙ্গে for sale অথবা sold টিকিট মারা থাকিবে? বিলাতী প্রথার কারণ বোধ হয় এই যে, বিলাতী সমাজে নারীর উপযাচিকা হইয়া পতিপ্রার্থনা করিবার রীতি এখনও তেমন চলে নাই, সেজন্য পুরুষ বিবাহিত কিনা তাহা নারীর না জানিলেও চলে। কিন্তু বিবাহার্থী পুরুষ আগেই জানিতে চায় নারী অনূঢ়া কিনা। এদেশে অধিকাংশ বিবাহই ভালরকম খোঁজখবর লইয়া সম্পাদিত হয়, সেজন্য নারীর নামে মার্কা দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক।

পরিশেষে আর একটি কথা নিবেদন করি। বাঙালী মহিলা দ্বিজবর্ণা হইলে নামান্তে দেবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজা নহেন তাঁহারা সেকালে দাসী লিখিতেন, এখন স্বামীর পদবী বা অনূঢ়া হইলে পিতৃপদবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজাতির দেবত্বের দাবি করেন তাঁহারা দেবী লিখুন, কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যেসকল মহিলা বংশগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন না

তাঁহারা কেন নামের শেষে দেবী লিখিয়া দ্বিজেতরা নারী হইতে পৃথক গণ্ডিতে থাকিবেন? অবশ্য নারী মাত্রেই যদি দেবী হন তবে আপত্তির কারণ নাই, বরং একটা সুবিধা হইতে পারে। অনাত্মীয়া অথচ সুপরিচিতা মহিলাকে মাসী পিসী দিদি বউদিদি বলিয়া অথবা নাম ধরিয়া ডাকা চলে। কিন্তু অল্প-পরিচিতার সঙ্গে হঠাৎ সম্বন্ধ পাতানো যায় না, কেবল নাম ধরিয়া ডাকাও বেয়াদবি। যদি নামের সঙ্গে দেবী যোগ করিয়া ডাকার প্রচলন হয় তবে বাংলা কথাবার্তায় শ্রুতিকটু মিস আর মিসিস বাদ দেওয়া চলে। কুমারী বা বিবাহিতা, তরুণী বা বৃদ্ধা যাহাই হোন, 'শুনছেন অমুকা দেবী' বলিয়া ডাকিলে দোষ কি?

১৩৩০

# ডাক্তারি ও কবিরাজি

আমি চিকিৎসক নহি, তথাপি আমার তুল্য অব্যবসায়ীর চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার আছে। আমার এবং আমার উপর যাঁহারা নির্ভর করেন তাঁহাদের মাঝে মাঝে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এবং সেই চিকিৎসা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তাহা আমাকেই স্থির করিতে হয়। অ্যালোপাথি, হোমিওপাথি, কবিরাজি, হাকিমি, পেটেণ্ট, স্বস্ত্যয়ন, মাদুলি, আরও কত কি—এইসকল নানা পন্থা হইতে একটি বা ততোধিক আমাকে বাছিয়া লইতে হয়। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের উপদেশে বিশেষ সুবিধা হয় না, কারণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আমারই তুল্য। আর, যদি কেহ চিকিৎসক বন্ধু থাকেন, তাঁহার মত একবারেই অগ্রাহ্য, কারণ তিনি আপন পদ্ধতিতে অন্ধবিশ্বাসী। অগত্যা জীবনমরণ সংক্রান্ত এই বিষম দায়িত্ব আমারই উপর পড়ে।

শুনিতে পাই চিকিৎসাবিদ্যা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। বিজ্ঞানের নামে আমরা একটু অভিভূত হইয়া পড়ি। ডাক্তার, কবিরাজ, মাদুলিবিশারদ সকলেই বিজ্ঞানের দোহাই দেন। কাহার শরণাপন্ন হইব? সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এত গণ্ডগোল নাই। ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবী গোল। সব

প্রমাণ মনে নাই, মনে থাকিলেও পরীক্ষার প্রবৃত্তি নাই। সকলেই বলে পৃথিবী গোল, অতএব আমিও তাহা বিশ্বাস করি। যদি ভবিষ্যতে পৃথিবী ত্রিকোণ বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের মত বদলাইতে দেরি হইবে না। কিন্তু চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে লোকে একমত নয়, সেজন্য সকলেই একটা গতানুগতিক বাঁধা রাস্তায় চলিতে চায় না।

সর্বাবস্থায় সকল রোগীকে নিরাময় করার ক্ষমতা কোনও পদ্ধতির নাই, আবার অনেক রোগ আপনাআপনি সারে অথচ চিকিৎসার কাকতালীয় খ্যাতি হয়। অতএব অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন লোক আপন বুদ্ধি ও সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন চিকিৎসার শরণ লইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিকিৎসা-নির্বাচনে এত মতভেদ থাকিলেও দেখা যায় যে, মাত্র কয়েকটি পদ্ধতির প্রতিই লোকের সমধিক অনুরাগ। ব্যক্তিগত জনমত যতটা অব্যবস্থ, জনমতসমষ্টি তত নয়। ডাক্তারি ( অ্যালোপাথি ), হোমিওপাথি ও কবিরাজি বাংলা দেশে যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার তুলনায় অন্যান্য পদ্ধতি বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

যাঁহারা ক্ষমতাপন্ন তাঁহারা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু সকলের সামর্থ্যে তাহা কুলায় না, সরকার বা জনসাধারণের আনুকূল্যের উপর আমাদের অনেককেই নির্ভর করিতে হয়। যে পদ্ধতি সরকারী সাহায্যে পুষ্ট তাহাই সাধারণের সহজলভ্য। যদি রাজমত

বা জনমত বহু পদ্ধতির অনুরাগী হয় তবে অর্থ ও উদ্যমের সংহতি খর্ব হয়, জনচিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অতএব উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন যেমন বাঞ্ছনীয়, মতৈক্য তেমনই বাঞ্ছনীয়।

দেশের কর্তা ইংরেজ, সেজন্য বিলাতে যে চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত আছে এদেশে তাহাই সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কবিরাজির সপক্ষে আন্দোলন চলিতেছে যে এই সুলভ সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসাপদ্ধতিকে সাহায্য করা সরকারের অবশ্যকর্তব্য। হোমিওপাথিরও বহু ভক্ত আছে, তথাপি তাহার পক্ষে এমন আন্দোলন হয় নাই। কারণ বোধ হয় এই—হোমিওপাথি সর্বাপেক্ষা অল্পব্যয়সাপেক্ষ, সেজন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। সরকারী সাহায্যের বখরা লইয়া যে দুটি পদ্ধতিতে এখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে, অর্থাৎ সাধারণ ডাক্তারি ও কবিরাজি, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। হাকিমি-চিকিৎসা ভারতের অন্যত্র কবিরাজির তুল্যই জনপ্রিয়, কিন্তু বাংলা দেশে তেমন প্রচলিত নয় সেজন্য তাহার আলোচনা করিব না। তবে কবিরাজি সম্বন্ধে যাহা বলিব হাকিমি সম্বন্ধেও তাহা মোটামুটি প্রয়োজ্য।

যাঁহারা প্রাচ্য পদ্ধতির ভক্ত তাঁহাদের সনির্বন্ধ আন্দোলনে সরকার একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিয়াছেন—বেশ তো, একটা কমিটি করিলাম, ইঁহারা বলুন প্রাচ্য পদ্ধতি সাহায্য-লাভের যোগ্য কিনা, তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। এই

কমিটি দেশী বিলাতী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মত লইয়াছেন। এযাবৎ যাহা লইয়া মতভেদ হইয়া আসিতেছে তাহা সাধারণের অবোধ্য নয়। সরকারী অর্থসাহায্য যাহাকেই দেওয়া হোক তাহা সাধারণেরই অর্থ, অতএব সাধারণের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা অকর্তব্য। অর্থ ও উদ্যম যাহাতে যোগ্য পাত্রে যোগ্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তাহা সকলেরই দেখা উচিত।

প্রাচ্য পদ্ধতির বিরোধীরা বলেন—তোমাদের শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। বাত পিত্ত কফ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, এ সকল কেবল হিং টিং ছট। তোমাদের ঔষধে কিছু কিছু ভাল উপাদান আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিস্তর বাজে জিনিস মিশাইয়া অনর্থক আড়ম্বর করা হইয়াছে। তোমাদের ঋষিরা প্রাচীন আমলের হিসাবে খুব জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু তোমরা কেবল অন্ধভাবে সেকালের অনুসরণ করিতেছ, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে পার নাই। তোমরা ভাব যাহা শাস্ত্রে আছে তাহাই চূড়ান্ত, তাহার পর আর কিছু করিবার নাই—অথচ তোমরা আয়ুর্বেদবর্ণিত শস্ত্রচিকিৎসার মাথা খাইয়াছ। চিকিৎসায় পারদর্শী হইতে গেলে যেসব বিদ্যা জানা দরকার, যথা আধুনিক শারীরবৃত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, জীবাণুবিদ্যা ইত্যাদি, তাহার কিছুই জান না। মুখে যতই আস্ফালন কর ভিতরে ভিতরে তোমাদের আত্মনির্ভরতায় শোষ ধরিয়াছে, তাই লুকাইয়া কুইনীন চালাও। তোমাদের সাহায্য করিলে কেবল কুসংস্কার ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া

হইবে। এইবার আমাদের কথা শোন।—আমরা কোনও প্রাচীন যোগী-ঋষির উপর নির্ভর করি না। হিপোক্রাটিস গালেন প্রভৃতির আমরা অন্ধ শিষ্য নহি। আমাদের বিদ্যা নিত্য উন্নতিশীল। পূর্বসংস্কার যখনই ভুল বলিয়া জানিতে পারি তখনই তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করি। বিজ্ঞানের যে কোনও আবিষ্কারের সাহায্য লইতে আমাদের দ্বিধা নাই। ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া নব নব ঔষধ ও চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করি। আমাদের কেহ কেহ মকরধ্বজ ব্যবস্থা করেন বটে. কিন্তু গোপনে নয় প্রকাশ্যে। আমাদের কুসংস্কার ও কূপ-মণ্ডূকতা নাই।

অপর পক্ষ বলেন—আচ্ছা বাপু, তোমাদের বিজ্ঞান আমরা জানি না, মানিলাম। কিন্তু আমাদের এই যে বিশাল আয়ুর্বেদশাস্ত্র, তোমরা কি তাহা অধ্যয়ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ? বাত পিত্ত কফ না বুঝিয়াই ঠাট্টা কর কেন? আমাদের অবনতি হইয়াছে স্বীকার করি, এখন আর আমাদের মধ্যে নূতন ঋষি জন্মেন না। অগত্যা যদি আমরা পুরাতন ঋষির উপদেশেই চলি, সেটা কি মন্দের ভাল নয়? তোমাদের পদ্ধতিতে অনেক খরচ। তোমাদের স্কুলে একটা হাতুড়ে ডাক্তার উৎপন্ন করিতে যত টাকা পড়ে, তাহার সিকির সিকিতে আমাদের বড় বড় মহামহোপাধ্যায় গুরুগৃহে শিক্ষা-লাভ করিয়াছেন। তোমাদের ঔষধ পথ্য সরঞ্জাম সমস্তই মহার্ঘ, বিদেশের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। বিজ্ঞানের

অজুহাতে তোমরা চিকিৎসায় বিলাতী কুসংস্কার ও বিলাসিতা আমদানি করিয়াছ। আমাদের ঔষধপথ্য সমস্তই সস্তা, এদেশেই পাওয়া যায়, গরিবের উপযুক্ত। আমাদের ঔষধে যতই বাজে জিনিস থাক, স্পষ্ট দেখিতেছি উপকার হইতেছে। তোমাদের অনেক ঔষধে কোহল আছে। বিলাতী উদরে হয়তো তাহা সমুদ্রে জলবিন্দু, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্থ জঠরে সেই অপেয় অদেয় অগ্রাহ্য জিনিস ঢালিবে কেন? আমাদের দেশবাসীর ধাতু তোমাদের বিলাতী গুরুগণ কি করিয়া বুঝিবেন? তোমাদের চিকিৎসা যতই ভাল হোক, এই দরিদ্র দেশের কয়জনের ভাগ্যে তাহা জুটিবে? যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা ডাক্তারী চিকিৎসা করান, কিন্তু গরিবের ব্যবস্থা আমাদের হাতে দাও। বড় বড় ডাক্তার যাহাকে জবাব দিয়াছে এমন রোগীকেও আমরা সারাইয়াছি, বিদ্বান সম্ভ্রান্ত লোকেও আমাদের ডাকে, আমরাও মোটর চালাই। কেবল কুসংস্কারের ভিত্তিতে কি এতটা প্রতিপত্তি হয়? মোট কথা—তোমাদের বিজ্ঞান এক পথে গিয়াছে, আমাদের বিজ্ঞান অন্য পথে গিয়াছে। কিছু তোমরা জান, কিছু আমরা জানি। অতএব চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দ টাকার কিছু তোমরা লও, কিছু আমরা লই।

আমার মনে হয় এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে 'বিজ্ঞান' শব্দের অসংযত প্রয়োগ এবং 'চিকিৎসাবিজ্ঞান' ও 'চিকিৎসাপদ্ধতি'র অর্থবিপর্যয়। Eastern science, eastern system,

western science, western system—এসকল কথা প্রায়ই শোনা যায়। কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা ভাল।

'বিজ্ঞান' শব্দে যদি পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলিত জ্ঞান বুঝায় তবে তাহা দেশে দেশে পৃথক হইতে পারে না। যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জগতের গুণিসভার বিচারে উত্তীর্ণ হয় তাহাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ, সেজন্য কালে কালে সিদ্ধান্তের অল্পাধিক পরিবর্তন হইতে পারে। যাঁহারা বলেন—পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান মানি না, অপৌরুষেয় অথবা দিব্যদৃষ্টিলব্ধ সনাতন সিদ্ধান্তই আমাদের নির্বিচারে গ্রহণীয়—তাঁহাদের সহিত তর্ক চলে না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের এমন অর্থ হইতে পারে না যে একই সিদ্ধান্ত কোথাও সত্য কোথাও মিথ্যা। কুতার্কিক বলিতে পারে—শ্রাবণ মাসে বর্ষা হয় ইহা এদেশে সত্য বিলাতে মিথ্যা; মশায় ম্যালেরিয়া আনে ইহা এক জেলায় সত্য অন্য জেলায় মিথ্যা। এরূপ হেত্বাভাস খণ্ডনের আবশ্যকতা নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের একমাত্র অর্থ —বিভিন্ন দেশে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যাহা সর্বদেশেই মান্য।

বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানীর সম্পত্তি নয়। সাধারণ লোক আর বিজ্ঞানীর এই মাত্র প্রভেদ যে বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত অধিকতর সূক্ষ্ম শৃঙ্খলিত ও ব্যাপক। আমরা সকলেই

বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। অগ্নিপক্ক দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রন্ধন করি, দেহ-আবরণে শীতনিবারণ হয় এই তথ্য জানিয়া বস্ত্রধারণ করি। কতক সংস্কারবশে করি, কতক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করি। অসত্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াও অনেক কাজ করি বটে, কিন্তু জীবনের যাহা কিছু সফলতা তাহা সত্য সিদ্ধান্ত দ্বারাই লাভ করি। চরক বলিয়াছেন—

সমগ্রং দুঃখমায়াতমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ং।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ শারীরিক মানসিক সমগ্র দুঃখ অবিজ্ঞানজনিত। সমগ্র সুখ বিমল বিজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত।

গাড়িতে চাকা লাগাইলে সহজে চলে এই সিদ্ধান্ত কোন্ দেশে কোন্ যুগে কোন্ মহাবিজ্ঞানী কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল জানা যায় নাই, কিন্তু সমস্ত জগৎ বিনা তর্কে ইহার সৎপ্রয়োগ করিতেছে। চশমা ক্ষীণ দৃষ্টির সহায়তা করে এই সত্য পাশ্চাত্ত্য দেশে আবিষ্কৃত হইলেও এদেশের লোক তাহা মানিয়া লইয়াছে। বিজ্ঞান বা সত্য সিদ্ধান্তের উৎপত্তি যেখানেই হোক, তাহার জাতিদোষ থাকিতে পারে না, বয়কট চলিতে পারে না।

কিন্তু কি করিয়া বুঝিব অমুক সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক কি না? বিজ্ঞানীদের মধ্যেও মতভেদ হয়। আজ যাহা অভ্রান্ত

গণ্য হইয়াছে ভবিষ্যতে হয়তো তাহাতে ত্রুটি বাহির হইবে অতএব সিদ্ধান্তেরও মর্যাদাভেদ আছে। মোটামুটি সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে এই দুই শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে—

১। যাহার পরীক্ষা সাধ্য এবং বারংবার হইয়াছে।

২। যাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইতে পারে নাই অথবা হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যাহা অনুমানসিদ্ধ এবং যাহার সহিত কোনও সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের বিরোধ এখন পর্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

বলা বাহুল্য, প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্তেরই ব্যাবহারিক মূল্য অধিক। এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত আরও নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে যাহা এখনও অপরীক্ষিত অথবা কেবল লোকপ্রসিদ্ধি বা ব্যক্তি-বিশেষের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এপ্রকার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অনেক কাজ করিয়া থাকি, কিন্তু এগুলিকে বিজ্ঞানের শ্রেণীতে ফেলা অনুচিত।

চিকিৎসা একটি ব্যাবহারিক বিদ্যা। ইহার প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিজ্ঞানের সকলগুলি সমান উন্নত নয়। কৃত্রিম যন্ত্রের কার্যকারিতা অথবা এক দ্রব্যের উপর অপর দ্রব্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে যত সহজে পরীক্ষা চলে এবং পরীক্ষার ফল যেপ্রকার নিশ্চয়ের সহিত জানা যায়, জটিল মানবদেহের উপর সেপ্রকার সুনিশ্চিত পরীক্ষা সাধ্য নয়। অতএব চিকিৎসাবিদ্যায় সংশয়

ও অনিশ্চয় অনিবার্য। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর চিকিৎসাবিদ্যা যতটা নির্ভর করে, অল্পপরীক্ষিত অপরীক্ষিত কিংবদন্তীমূলক ও ব্যক্তিগত মতের উপর ততোধিক নির্ভর করে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সকল চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। অতএব বর্তমান অবস্থায় সমগ্র চিকিৎসাবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা অত্যুক্তি মাত্র, এবং তাহাতে সাধারণের বিচারশক্তিকে বিভ্রান্ত করা হয়।

কবিরাজগণ মনে করেন তাঁহাদের চিকিৎসাপদ্ধতি একটা স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান, অতএব ডাক্তারী বিদ্যার সহিত তাহার সম্পর্ক রাখা নিষ্প্রয়োজন। চিকিৎসাবিদ্যার যে অংশ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহা লইয়া মতভেদ চলিতে পারে, কিন্তু যাহা বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা বর্জন করা আত্মবঞ্চনা মাত্র। অমুক তথ্য বিলাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে অতএব তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই—কবিরাজগণের এই ধারণা যদি পরিবর্তিত না হয় তবে তাঁহাদের অবনতি অনিবার্য। এমন দিন ছিল যখন দেশের লোকে সকল রোগেই তাঁহাদের শরণ লইত। কিন্তু আজকাল যাঁহারা কবিরাজির অতিশয় ভক্ত তাঁহারাও মনে করেন কেবল বিশেষ বিশেষ রোগেই কবিরাজি ভাল। নিত্য উন্নতিশীল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির প্রভাবে কবিরাজী চিকিৎসার এই সংকীর্ণ সীমা ক্রমশ সংকীর্ণতর হইবে। পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিরই চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদেরও আয়ুর্বেদের প্রতি অবজ্ঞা

বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। নবলব্ধ বিদ্যার অভিমানে হয়তো তাঁহারা অনেক পুরাতন সত্য হারাইতেছেন। এইসকল সত্যের সন্ধান করা তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য। চরকের এই মহাবাক্য সকলেরই প্রণিধানযোগ্য—

নচৈব হি সুতরাং আয়ুর্বেদস্য পারং। তস্মাৎ
অপ্রমত্তঃ শশ্বৎ অভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ।…
কৃৎস্নোহি লোকো বুদ্ধিমতাং আচার্যঃ, শত্রুশ্চ
অবুদ্ধিমতাম্। এতচ্চ অভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা
অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যং আয়ুষ্যং লোকহিতকরং
ইতি উপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যং অনুবিধাতব্যঞ্চ।

অর্থাৎ—সুতরাং আয়ুর্বেদের শেষ নাই। অতএব অপ্রমত্ত হইয়া সর্বদা ইহাতে অভিনিবেশ করিবে।…বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সকলকেই গুরু মনে করেন, কিন্তু অবুদ্ধিমান সকলকেই শত্রু ভাবেন। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধনকর যশস্কর আয়ুষ্কর ও লোকহিতকর উপদেশবাক্য অমিত্রের নিকটেও শুনিবেন এবং অনুসরণ করিবেন।

কেহ কেহ বলিবেন, কবিরাজগণ যদি ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে কিছু গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা ভক্তগণের শ্রদ্ধা হারাইবেন—যদিও সেসকল ভক্ত আবশ্যকমত ডাক্তারী চিকিৎসাও করান। এ আশঙ্কা হয়তো সত্য। এমন লোক অনেক আছে যাহারা নিত্য অশাস্ত্রীয় আচরণ করে কিন্তু ধর্মকর্মের সময় পুরোহিতের নিষ্ঠার ত্রুটি সহিতে পারে না। সাধারণের এইপ্রকার

অসমঞ্জস গোঁড়ামির জন্য কবিরাজগণ অনেকটা দায়ী। তাঁহারা এযাবৎ প্রাচীনকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; সাধারণেও তাহাই শিখিয়াছে। তাঁহারা যদি বিজ্ঞাপনের ভাষা অন্যবিধ করেন এবং ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সাক্ষ্য একটু কমাইয়া বর্তমানকালোচিত যুক্তি প্রয়োগ করেন তবে লোকমতের সংস্কারও অচিরে হইবে।

শাস্ত্র ও ব্যবহার এক জিনিস নয়। হিন্দুর শাস্ত্র যাহা ছিল, তাহাই আছে, কিন্তু ব্যবহার যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে। অথচ সেকালেও হিন্দু ছিল, একালেও আছে। প্রাচীন চিন্তাধারার ইতিহাস এবং প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে শাস্ত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সযত্ন অধ্যয়নের বিষয়, কিন্তু কোনও শাস্ত্র চিরকালের উপযোগী ব্যাবহারিক পন্থা নির্দেশ করিতে পারে না। চরক-সুশ্রুতের যুগে অজ্ঞাত অনেক ঔষধ ও প্রণালী রসরত্নাকর ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির যুগে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কোনও একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত যেসকল আবিষ্কার বা উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাই আয়ুর্বেদের অন্তর্গত, তাহার পরে আর উন্নতি হইতে পারে না—এরূপ ধারণা অধোগতির লক্ষণ। নূতন জ্ঞান আত্মসাৎ করিলেই আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতির জাতিনাশ হইবে না। বিজ্ঞান ও পদ্ধতি এক নয়। বিজ্ঞান সর্বত্র সমান, কিন্তু পদ্ধতি দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বিভিন্ন সমাজের উপযোগী পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং একই

পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়াও আপন সমাজগত বৈশিষ্ট্য ও ধারা-বাহিকতা বজায় রাখিতে পারে।

বিলাতের লোক টেবিলে চিনামাটির বাসন কাচের গ্লাস ইত্যাদির সাহায্যে রুটি মাংস মদ খায়। আমাদের দেশের লোকের সামর্থ্য ও রুচি অন্যবিধ, তাই ভূমিতে বসিয়া কলাপাতা বা পিতল কাঁসার বাসনে ভাত ডাল জল খায়। উদ্দেশ্য এক, কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। হইতে পারে বিলাতী পদ্ধতি অধিকতর সভ্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। কিন্তু কলাপাতে ভাত ডাল খাইলেও বিজ্ঞানের অবমাননা হয় না। দেশীয় পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আলু কপির ব্যবহার বিলাত হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী প্রথায় রাঁধি। গ্লাসে জল খাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী রুচি অনুসারে পিতল কাঁসায় গড়ি। এইরূপ অনেক জিনিস অনেক প্রথা একটু বদলাইয়া বা পুরাপুরি লইয়া আপন পদ্ধতির অঙ্গীভূত করিয়াছি। অনেক দুষ্ট প্রথা শিখিয়া ভুল করিয়াছি, কিন্তু যদি নির্বিচারে ভাল মন্দ সকল বিদেশী প্রথাই বর্জন করিতাম তবে আরও বেশী ভুল করিতাম।

চাকা-সংযুক্ত গাড়ি যে একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্বে বলিয়াছি। আমি যদি ধনী হই এবং আমার দেশের রাস্তা যদি ভাল হয় তবে আমি মোটরে যাতায়াত করিতে পারি। কিন্তু যদি আমার অবস্থা মন্দ হয়, অথবা পল্লীগ্রামের কাঁচা অসম পথে যাইতে হয়, অথবা যদি

অন্য গাড়ি না জোটে, তবে আমাকে গরুর গাড়িই চড়িতে হইবে। আমি জানি, গোযান অপেক্ষা মোটরযান বহু বিষয়ে উন্নত এবং মোটরে যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে গোযানে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তথাপি আমি গরুর গাড়ি নির্বাচন করিয়া বিজ্ঞানকে অস্বীকার করি নাই। মোটরে যে অসংখ্য জটিল বৈজ্ঞানিক কৌশলের সমবায় আছে তাহা আমার অবস্থার অনুকূল নয়, অথচ যে সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর গরুর গাড়ি নির্মিত তাহাতে আমার কার্যোদ্ধার হয়। কিন্তু যদি গরুর গাড়ির মাঝে চাকা না বসাইয়া শেষ প্রান্তে বসাই অথবা ছোট বড় চাকা লাগাই তবে অবৈজ্ঞানিক কার্য হইবে। অথবা যদি আমাকে অন্ধকারে দুর্গম পথে যাইতে হয়, এবং কেহ গাড়ির সম্মুখে লণ্ঠন বাঁধিবার যুক্তি দিলে বলি—গরুর গাড়ির সামনে কস্মিন্‌কালে কেহ লণ্ঠন বাঁধে নাই, অতএব আমি এই অনাচার দ্বারা সনাতন গোযানের জাতিনাশ করিতে পারি না—তবে আমার মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি মোটরের প্রতি অন্ধ ভক্তির বশে মনে করি—বরং বাড়িতে বসিয়া থাকিব তথাপি অসভ্য গোযানে চড়িব না—তবে হয়তো আমার পঙ্গুত্বপ্রাপ্তি হইবে।

কেহ যেন মনে না করেন আমি কবিরাজী পদ্ধতিকে গরুর গাড়ির তুল্য হীন এবং ডাক্তারীকে মোটরের তুল্য উন্নত বলিতেছি। আয়ুর্বেদভাণ্ডারে এমন অনেক তথ্য নিশ্চয় আছে যাহা শিখিলে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণ ধন্য হইবেন।

আমার ইহাই বক্তব্য যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি একাধিক পদ্ধতিতে হইতে পারে, এবং অবস্থাবিশেষে অতি প্রাচীন অথবা অনুন্নত উপায়ও বিজ্ঞজনের গ্রহণীয়—যদি অন্ধ সংস্কার না থাকে এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে পরিবর্তন করিতে দ্বিধা না থাকে। এই পরিবর্তন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান বিষয়ে কেবল যে কবিরাজী পদ্ধতি উদাসীন তাহা নয়, ডাক্তারীও সমান দোষী। ডাক্তারী পদ্ধতি বিলাত হইতে যথাযথ উঠাইয়া আনিয়া এদেশে স্থাপিত করা হইয়াছে। তাহাতে যে নিত্যবর্ধমান তথ্য আছে সেসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহার ঔষধ কেবল বিলাতে জ্ঞাত ঔষধ, তাহার পথ্য বিলাতেরই পথ্য। এদেশে পাওয়া যায় কিনা, অনুরূপ বা উৎকৃষ্টতর কিছু আছে কিনা তাহা ভাবিবার দরকার হয় না। দেশীয় উপকরণে আস্থা নাই, কারণ তাহার সহিত পরিচয় নাই। যাহা আবশ্যক তাহা বিদেশ হইতে আসিবে অথবা বিলাতী রীতিতেই এদেশে প্রস্তুত হইবে। চিকিৎসার সমস্ত উপকরণ বিলাতের জ্ঞান বুদ্ধি অভ্যাস ও রুচি অনুসারে উৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য হওয়া চাই, আধেয় অপেক্ষা আধারের খরচ বেশী হইলেও ক্ষতি নাই, এই দরিদ্র দেশের সামর্থ্যে না কুলাইলেও আপত্তি নাই। দেশসুদ্ধ লোকের ব্যবস্থা নাই হইল, যে কয়জনের হইবে তাহা বিলাতের মাপকাঠিতে প্রকৃষ্ট হওয়া চাই। কাঙালী ভোজনের টাকা যদি কম হয় তবে বরঞ্চ জনকতককে পোলাও খাওয়ানো হইবে কিন্তু সকলকে

মোটাভাত দেওয়া চলিবে না। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থায় ইহাই দাঁড়াইয়াছে।

একদল পুরাতনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন, আর-একদল পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানের এবং বিলাসিতার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। একদিকে অসংস্কৃত সুলভ ব্যবস্থা, অন্যদিকে অতিমার্জিত উপচারের ব্যয়বাহুল্য। আমাদের কবিরাজ ও ডাক্তারগণ যদি নিজ নিজ পদ্ধতিকে কুসংস্কারমুক্ত এবং দেশের অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টা করেন, তবে ক্রমশ উভয় পদ্ধতির সমন্বয় হইয়া এদেশের উপযোগী জীবন্ত আয়ুর্বেদের উদ্‌ভব হইতে পারে। যাঁহারা এই উদ্‌যোগে অগ্রণী হইবেন তাঁহাদিগকে দেশী বিদেশী উভয়বিধ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং পক্ষপাত বর্জন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পদ্ধতি হইতে বিজ্ঞানসম্মত বিধান এবং চিকিৎসার যথাসম্ভব দেশীয় উপায় নির্বাচন করিতে হইবে। কেবল উৎকর্ষের দিকেই লক্ষ রাখিলে চলিবে না, যাহাতে চিকিৎসার উপায় বহুপ্রসারিত, দরিদ্রের সাধ্য এবং সুদূর পল্লীতেও সহজপ্রাপ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য যদি নূতন এক শ্রেণীর চিকিৎসক সৃষ্টি করিতে হয় এবং ব্যয়লাঘবের জন্য নিকৃষ্ট প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার্য। কবিরাজী পাচন অরিষ্ট চূর্ণ মোদক বটিকাদির প্রস্তুতপ্রণালী যদি অল্পব্যয়সাপেক্ষ হয় তবে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এপ্রকার ঔষধ যদি ডাক্তারী

টিংচার প্রভৃতির তুল্য প্রমাণসম্মত বা standardized অথবা অসার অংশ বর্জিত না হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। দেশের যে অসংখ্য লোকের ভাগ্যে কোনও চিকিৎসাই জুটে না তাহাদের পক্ষে মোটামুটি ব্যবস্থাও ভাল। ইহাতে চিকিৎসা-বিদ্যার অবনতি হইবার কারণ নাই, যাহার সামর্থ্য ও সুযোগ আছে সে প্রকৃষ্ট চিকিৎসাই করাইতে পারে। অবশ্য যদি দেশের অবস্থা উন্নত হয় তবে নিম্নস্তরের চিকিৎসাও ক্রমে উচ্চস্তরে পেঁাছিবে।

কবিরাজগণ দেশীয় ঔষধের গুণাবলী এবং প্রস্তুতপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত। ঔষধের বাহ্য আড়ম্বরের উপর তাঁহাদের অন্ধভক্তি নাই। পক্ষান্তরে ডাক্তারগণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অধিকতর উন্নত। অতএব উভয় পক্ষের মতবিনিময় না হইলে এই সমন্বয় ঘটিবে না।

এইপ্রকার চিকিৎসা-সংস্কারের জন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক। প্রচলিত কবিরাজী পদ্ধতিকে সাহায্য করিলে দেশে চিকিৎসার অভাব অনেকটা দূর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না, ডাক্তারির ব্যয়বাহুল্য এবং কবিরাজির গতানুবর্তিতা কমিবে না। যদি অর্থ ও উদ্যমের সৎপ্রয়োগ করিতে হয় তবে সরকারী সাহায্যে এইপ্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়া উচিত—

১। ডাক্তারী স্কুল-কলেজে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে আয়ুর্বেদকে স্থান দেওয়া। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র না পড়িলে যেমন

ফিলসফি-শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, চিকিৎসাবিদ্যাও তেমনই আয়ুর্বেদের অপরিচয়ে খর্ব হয়।

২। সাধারণের চেষ্টায় যেসকল আয়ুর্বেদীয় বিদ্যাপীঠ গঠিত হইয়াছে বা হইবে তাহাদের সাহায্য করা। সাহায্যের শর্ত এই হওয়া উচিত যে চিকিৎসাবিদ্যার আনুষঙ্গিক আধুনিক বিজ্ঞানসকলের যথাসম্ভব শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। বিলাতী ফার্মাকোপিয়ার অনুরূপ এদেশের উপযোগী সাধারণপ্রয়োজ্য ঔষধসকলের তালিকা ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংকলন। ডাক্তারী চিকিৎসায় যদিও অসংখ্য ঔষধ প্রচলিত আছে তথাপি ফার্মাকোপিয়া-ভুক্ত ঔষধসকলেরই ব্যবহার বেশী। বিলাতে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত সমিতি দ্বারা এই ভৈষজ্যতালিকা প্রস্তুত হয়। দশ পনর বৎসর অন্তর ইহার সংস্করণ হয়, যেসকল ঔষধ অকর্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হয়, সুপরীক্ষিত নূতন ঔষধ গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনবোধে ঔষধ তৈয়ারির নিয়মও পরিবর্তিত হয়। এদেশে এককালে শার্ঙ্গধর এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সকল সভ্য দেশেরই আপন ফার্মাকোপিয়া আছে এবং তাহা দেশের প্রথা ও রুচি অনুসারে সংকলিত হইয়া থাকে। এদেশের ফার্মাকোপিয়ায় বর্তমান কালের উপযোগী সুপরীক্ষিত যথাসম্ভব দেশীয় উপাদানের সন্নিবেশ হওয়া উচিত। ঔষধ তৈয়ারির যেসকল ডাক্তারী প্রণালী আছে তাহার অতিরিক্ত আয়ুর্বেদীয় প্রণালীও থাকা উচিত।

অবশ্য যেসকল ঔষধ বা প্রণালী বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, অখ্যাত বা অপরীক্ষিত তাহা বর্জিত হইবে। কেবল কিংবদন্তীর উপর অত্যধিক নির্ভর অকর্তব্য। কিন্তু দেশীয় অমুক ঔষধ বা প্রণালী বিলাতী অমুক ঔষধ বা প্রণালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়াই বর্জিত হইবে না, ব্যয়লাঘব ও সৌকর্যের উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এপ্রকার ভৈষজ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে পক্ষপাতহীন উদারমতাবলম্বী ডাক্তার ও কবিরাজের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই সংযোগ দুঃসাধ্য, কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই হতাশ হইবার কারণ নাই। এখন ডাক্তারগণই প্রবল পক্ষ, সুতরাং প্রথম উদ্যমে তাঁহারাই এক-যোগে সাক্ষী ও বিচারকের আসন গ্রহণ করিবেন এবং কবিরাজগণকে কেবল সাক্ষ্য দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। প্রথম যাহা দাঁড়াইবে তাহা যতই সামান্য হউক, শিক্ষার বিস্তার ও জ্ঞানবিনিময়ের ফলে ভবিষ্যতের পথ ক্রমশ সুগম হইবে।

৪। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাসম্ভব পূর্বোক্ত দেশীয় উপাদান ও দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধের প্রয়োগ। যে-সকল নূতন চিকিৎসক আয়ুর্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়বিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইবেন তাঁহারা সহজেই এইসকল নূতন ঔষধ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এদেশের প্রতিষ্ঠাবান অনেক ডাক্তার আয়ুর্বেদকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এইসকল নবপ্রবর্তিত দেশীয় ঔষধের প্রচলনে সাহায্য করিতে পারেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা কার্যে পরিণত করা অর্থ উত্তম ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিকে কালোপযোগী করা এবং চিকিৎসার উপায় সাধারণের পক্ষে সুলভ করার অন্যবিধ পন্থা খুঁজিয়া পাই না। সরকারী সাহায্য মিলিলেই কার্যোদ্ধার হইবে না, চিকিৎসক অচিকিৎসক সকলেরই উৎসাহ আবশ্যক। মোট কথা, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব এমন হয় যে, জ্ঞান সর্বত্র আহরণ করিব, কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োগ দেশের সামর্থ্য অভ্যাস ও রুচি অনুসারে করিব, তবেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সহজ হইবে।

১৩৩১

# ভদ্র জীবিকা

বাংলার ভদ্রলোকের দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে দ্বিমত নাই। দেশের অনেক মনীষী প্রতিকারের উপায় ভাবিতেছেন এবং জীবিকানির্বাহের নূতন পন্থা নির্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বর্তমান সমস্যার সমাধান যে উপায়েই হউক, তাহা শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে না। রোগের বীজ ধীরে ধীরে সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ঔষধনির্বাচন মাত্রই রোগমুক্তি হইবে না। সতর্কতা চাই, ধৈর্য চাই, উপায়ের প্রতি শ্রদ্ধা চাই। রোগের নিদান একটি নয়, নিবারণের উপায়ও একটি হইতে পারে না। যে যে উপায়ে প্রতিকার সম্ভবপর বোধ হয় তাহার প্রত্যেকটি সাবধানে নির্বাচন করা উচিত, নতুবা ভুল পথে গিয়া দুর্দশার কালবৃদ্ধি হইবে।

দুর্দশা কেবল ভদ্রসমাজেই বর্তমান এমন নয়। কিন্তু সমগ্র বাঙালীসমাজের অবস্থার বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়, সেজন্য কেবল তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কথাই বলিব। 'ভদ্র' বলিলে যে শ্রেণী বুঝায় তাহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই আছেন। অন্যধর্মীর ভদ্রসমাজে ঠিক কি ভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আমার জানা নাই, সেজন্য হিন্দু ভদ্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। প্রতিকারের পন্থা যে সকলের পক্ষেই সমান তাহা বলা বাহুল্য।

শতাধিক বৎসর পূর্বে 'ভদ্র' বলিলে কেবল ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এবং অপর কয়েকটি সম্প্রদায় মাত্র বুঝাইত। ভদ্রের উৎপত্তি প্রধানত জন্মগত হইলেও একটা গুণকর্মবিভাগজ বিশিষ্টতা সেকালেও ছিল। ভদ্রের প্রধান বৃত্তি ছিল—জমিদারি বা জমির উপসত্ত্ব ভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি, অথবা তেজারতি। বহু ব্রাহ্মণ যাজন ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, অধিকাংশ বৈদ্য চিকিৎসা করিতেন। ভদ্রশ্রেণীর অল্প কয়েকজন রাজকার্য করিতেন, এবং কদাচিৎ কেহ কেহ নবাগত ইংরেজ বণিকের অধীনে চাকরি লইতেন। বাণিজ্যবৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্র গৃহস্থ প্রতিবেশী ধনী বণিককে অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখিতেন। উভয় গৃহস্থের মধ্যে সামাজিক সদ্‌ভাব থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা জমিদারি এবং মামলা পরিচালনের দক্ষতাকেই বৈষয়িক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন, প্রতিবেশী বণিক কোন্ বিদ্যার সাহায্যে অর্থ উপার্জন করিতেছেন তাহার সন্ধান লইতেন না। বণিকের জাতিগত নিকৃষ্টতা এবং অমার্জিত আচারব্যবহারের সঙ্গে তাঁহার অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্র-সমাজে উপেক্ষিত হইত। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখনও বর্তমান, কেবল প্রভেদ এই—বাঙালী বণিকও তাঁহাদের বংশ-পরম্পরালব্ধ বিদ্যা হারাইতে বসিয়াছেন। আর, যাঁহারা ভদ্র বলিয়া গণ্য তাঁহারা এতদিন তাঁহাদের অতি নিকট প্রতিবেশীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া আজ হঠাৎ

আবিষ্কার করিয়াছেন যে ব্যবসায় না শিখিলে তাঁহাদের আর চলিবে না।

একালের তুলনায় সেকালের ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু তখন বিলাসিতা কম ছিল, অভাব কম ছিল, জীবনযাত্রাও অল্প ব্যয়ে নির্বাহ হইত। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক যুগান্তর আসিল। বাঙালী বুঝিল—এই নূতন বিদ্যায় কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, অর্থাগমেরও সুবিধা হয়। কেরানীযুগের সেই আদি কালে সামান্য ইংরেজী জ্ঞান থাকিলেই চাকরি মিলিত। অনেক ভদ্রসন্তানেরই সেরেস্তার কাজের সহিত বংশানুক্রমে পরিচয় ছিল, সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই তাঁহারা নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। জনকতক অধিকতর দক্ষ ব্যক্তির ভাগ্যে উচ্চতর সরকারী চাকরিও জুটিল। আবার যাঁহারা সর্বাপেক্ষা সাহসী ও উদ্‌যোগী তাঁহারা নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তখন প্রতিযোগিতা কম ছিল, অর্থাগমের পথও উন্মুক্ত ছিল।

এইরূপে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রশ্রেণী নূতন জীবিকার সন্ধান পাইলেন। বাঙালী ভদ্রসন্তানই ইংরেজী শিক্ষার অগ্রণী ছিলেন, সুতরাং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অর্থাগম এবং ইংরেজের অনুকরণের ফলে বিলাসিতা বাড়িতে লাগিল, জীবনযাত্রার প্রণালীও ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

এইসকল নূতন ধনীর প্রতিপত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাদের উপার্জনের পরিমাণ যাহাই হউক, কিন্তু কি বিদ্যা! কেমন চালচলন! ভদ্রসন্তান দলে দলে এই নূতন মার্গে ছুটিল। সেকালে নিষ্কর্মা ভদ্রলোকের সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে একজনের রোজগারে অনেক বেকারের ভরণপোষণ হইত। সভ্যতা ও বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জকের নিজ খরচ বাড়িয়া চলিল, বেকারগণ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। এতদিন যাঁহারা আত্মীয়ের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক মনে করিতেন, অভাবের তাড়নায় তাঁহারও চাকরির উমেদার হইলেন। অপর শ্রেণীর লোকেরাও পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া সম্মান বৃদ্ধির আশায় ভদ্রের পদানুসরণ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞার্থ পরিবর্তিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ দাঁড়াইল—জীবনযাত্রার প্রণালীবিশেষ। ভদ্রতালাভের উপায় হইল—বিশেষপ্রকার জীবিকা গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল কলেজের বিদ্যা, এবং জীবিকার অর্থ হইল—উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা চাকরি।

নূতন কূপের সন্ধান পাইয়া কয়েকটি ভদ্রমণ্ডূক সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কূপের মহিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মাঠের মণ্ডূক হাটের মণ্ডূক দলে দলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ভদ্রতালাভ করিল। কূপমণ্ডূকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু আহার্য ফুরাইয়াছে।

ভদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। সকল জীবিকা ভদ্রের গ্রহণীয় নয়, কেবল কয়েকটি জীবিকাতেই ভদ্রতা বজায় থাকিতে পারে। সেকালের তুলনায় এখন ভদ্রোচিত জীবিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু ভদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে নাই। কেতাবী বিদ্যা অর্থাৎ স্কুল-কলেজে লব্ধ বিদ্যা যে জীবিকায় প্রয়োগ করা যায় তাহাই সবাপেক্ষা লোভনীয়। কেরানীগিরির বেতন যতই অল্প হউক, ওকালতিতে পসারের সম্ভাবনা যতই কম হউক, তথাপি এসকলে একটু কেতাবী বিদ্যা খাটাইতে পারা যায়। মুদিগিরি পুরানো লোহা বিক্রয় বা গরুর গাড়ির ঠিকাদারিতে বিদ্যাপ্রয়োগের সুযোগ নাই, সুতরাং এসকল ব্যবসায় ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু কেতাবী বৃত্তিতে যখন আর অন্নের সংস্থান হয় না, তখন অপর বৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। নিতান্ত নাচার হইয়া বাঙালী ভদ্রসন্তান ক্রমশ অকেতাবী বৃত্তিও লইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু খুব সন্তর্পণে বাছিয়া লইয়া। যে বৃত্তি পুরাতন এবং নিম্নশ্রেণীর সহিত জড়িত তাহা ভদ্রের অযোগ্য। কিন্তু যাহার নূতন আমদানি হইয়াছে কিংবা যাহার ইংরেজী নামই প্রচলিত, সেরূপ বৃত্তিতে ভদ্রতার তত হানি হয় না। ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, ধোবার কাজ, কোচমানি, মুদিগিরি চলিবে না ; কিন্তু ঘড়ি বা বাইসিকেল মেরামত, নক্শা আঁকা, ডাইং-ক্লিনিং, চাএর দোকান, মাংসের হোটেল, স্টেশনারি-শপ—এসকলে আপত্তি নাই, কারণ সমস্তই আধুনিক বা ইংরেজী নামে পরিচিত।

কিন্তু এইসকল নূতন বৃত্তিতে বেশী রোজগার করা সহজ নয়। দরিদ্র ভদ্রসন্তান উহা গ্রহণ করিয়া কোনও রকমে সংসার চালাইতে পারে, কিন্তু যাহাদের উচ্চ আশা তাহারা কি করিবে? চাকরি দুর্লভ, উকিলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারিতে পসার অনিশ্চিত, এঞ্জিনিয়ার প্রফেসার প্রভৃতি বিদ্যাজীবীর পদও বেশী নাই। বিলাতে অনেকে পাদরী হয়, সৈনিক হয়, নাবিক হয়; কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে এসকল বৃত্তি নাই।

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে, তাহার চারিদিকে গণ্ডি। গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয়দান করিবে?

অনেকেই বলিতেছেন—অর্থকরী বিদ্যা শেখাও, ইউনিভার্সিটির পাঠ্য বদলাও। ছেলেরা অল্পবয়স হইতে হাতে-কলমে কাজ করিতে শিখুক, তাহার পর একটু বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প-উৎপাদন শিখুক। যাহারা বিজ্ঞান বোঝে না তাহারা banking, accountancy, economics প্রভৃতিতে মন দিক। দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হইলেই বেকারের সমস্যা কমিবে।

উত্তম কথা, কিন্তু অতি বৃহৎ কার্য। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, ঔষধের ফর্দও প্রস্তুত, কিন্তু এখনও অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় নাই, মাত্রাও স্থির হয় নাই, রোগীকে কেবল আশ্বাস দেওয়া

হইতেছে। ঔষধসেবনে যদি বাঞ্ছিত সুফল না হয় তবে সে নিরাশায় মরিবে। অতএব প্রত্যেক উপকরণের ফলাফল বিচার কর্তব্য, যাহাতে রোগীর কাছে সত্যের অপলাপ না হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতেকলমে কাজ শেখানো। আমার যতটা জানা আছে, এই কাজের প্রচলিত অর্থ—ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, দরজীর কাজ, সুতা কাটা, তাঁত বোনা, নক্‌শা করা ও কৃষি। যেসকল ছাত্রের ঐ জাতীয় কাজ কৌলিক ব্যবসায়, কিংবা যাহারা ভবিষ্যতে ঐ কাজ বৃত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রকার শিক্ষা নিশ্চয় হিতকর। যাহারা অবস্থাপন্ন এবং রোজগার সম্বন্ধে উচ্চ আশা রাখে, তাহারাও উপকৃত হইবে, কারণ মনুষ্যত্ববিকাশের জন্য যেমন বুদ্ধির পরিচর্যা ও ব্যায়ামশিক্ষা আবশ্যক, হাতের নিপুণতা তেমনই আবশ্যক। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ছাত্রের পক্ষে এইপ্রকার শিক্ষা কেবল গৌণভাবেই হিতকর, মুখ্যভাবে উপার্জনের কোনও সহায়তা করিবে না।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পশিক্ষা। Mechanical ও electrical engineering, agriculture, surveying, banking, accountancy ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা অল্পবিস্তর আছে। এখন কয়েকপ্রকার নূতন শিল্প শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে, যথা—চামড়া, সাবান, কাচ, চীনা-মাটির জিনিস, বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ারি এবং

সুতা ও কাপড় রং করার প্রণালী। উদ্দেশ্য এই যে, দেশে অনেক নূতন ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যা, যথা—engineering, accountancy ইত্যাদি শিখিলে চাকরির ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা কি পরিমাণে হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা বলিলে সাধারণত সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবক-গণ যখন দেখিলেন যে কেবল এইপ্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্যকরী বিদ্যা; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা হইবে এবং ভদ্রসন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য সাহিত্য দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দলে দলে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল, বি. এস-সি এম. এস-সিতে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য? আত্মীয়স্বজন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরানী বা উকিল হইল! হায়, ছোকরা কি করিবে? বিজ্ঞান ও কার্যকরী বিদ্যা এক নয়। কেমিস্ট্রি ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞানের প্রয়োগে দক্ষতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা, যাহাকে বলে technical education। অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্বাচনে ভুল করিয়া পূর্বে হতাশ হইয়াছি, এবারেও কি আশা নাই? সাবান কাচ চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরানীগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে?

আশা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আশার মাত্রা অসংগত ছিল তাই ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, এবং এবারেও হয়তো সম্ভাব্যের অতিরিক্ত ফল কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞানে শিল্পজাত দ্রব্যের যে উল্লেখ থাকে তাহা উদাহরণ-রূপেই থাকে, উৎপাদনের প্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া বলা হয় না এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় না। বিজ্ঞান-পাঠে কয়েকটি শিল্প সম্বন্ধে একটা স্থূল জ্ঞান লাভ হয়, এবং দেশবাসীর মধ্যে এই জ্ঞান যত বিস্তৃত হয় শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। যেসকল কারণ বর্তমান থাকিলে দেশে শিল্পবৃদ্ধি সহজ হয়, বিজ্ঞানশিক্ষা তাহার অন্যতম কারণ, প্রধান কারণও বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

তাহার পর technical education বা শিল্পশিক্ষা। ইহার অর্থ—যে প্রণালীতে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই প্রণালীর

সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। অনেকে মনে করেন ইহাই শিল্প-প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এই বিশ্বাস কতদূর সংগত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বিজ্ঞানে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু খাদ্য তৈয়ারি বা রন্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ নাই। বিজ্ঞান পড়িলে রন্ধন শেখা যায় না, তাহার জন্য দক্ষ ব্যক্তির কাছে হাতা-খন্তির ব্যবহার অভ্যাস করিতে হয়। এই শিক্ষা লাভ করিলে পাচকের চাকরি মিলিতে পারে এবং অবস্থা অনুসারে অভ্যস্ত রীতির একটু আধটু বদল করিলে মনিবকেও খুশী করা যায়। আয়ব্যয়ের কথা ভাবিতে হয় না, তাহা মনিবের লক্ষ্য। কিন্তু যদি কোনও উচ্চাভিলাষী লোক রন্ধনবিদ্যাকে একটা বড় কারবারে লাগাইতে চায়, অর্থাৎ হোটেল খুলিয়া জনসাধারণকে রন্ধনশিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়, তবে কেবল পাচকের অভিজ্ঞতাতেই কুলাইবে না, বিস্তর নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মূলধন চাই, উপযুক্ত জায়গায় বাড়ি চাই, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল খরিদ চাই, লোক খাটাইবার ক্ষমতা চাই, যথাকালে বহুলোকের আহার্য সরবরাহ চাই, হিসাব রাখা, টাকা আদায়, আয়ব্যয় খতাইয়া লাভ-লোকসান নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই। এই অভিজ্ঞতা কোনও শিক্ষালয়ে পাওয়া যায় না।

সর্বপ্রকার শিল্প এবং ব্যবসায়ের পথই এইরূপ অল্পাধিক দুর্গম। শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা যাহার ব্যবসায়, সে ঠিক

কি প্রণালী অবলম্বন করে এবং কোন্ উপায়ে ব্যবসায়ের কঠোর প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করে তাহা অপরকে জানিতে দেয় না। সুতরাং technical education পাইলেই ব্যবসায়বুদ্ধি জন্মিবে না এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে না। চাকরি মিলিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা অল্প। শিক্ষা শেষ হইলেই অধিকাংশ যুবক স্বাধীন কারবার আরম্ভ করিতে পারিবে ইহা দুরাশা মাত্র।

যাহা বলা হইল তাহার ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক আছে। অনেক দৃঢ়সংকল্প উদ্যোগী ব্যক্তি কেবল পুঁথিগত বিজ্ঞান চর্চা করিয়া কিংবা বিজ্ঞানের কোনও চর্চা না করিয়া এবং অপরের সাহায্য না পাইয়াও শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞানচর্চা এবং কার্যকরী শিক্ষার বিস্তারের ফলে এই সুযোগ বর্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ পূর্বে যদি এক লক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে একজন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইয়া থাকেন, তবে এখন হয়তো দশজন হইবেন। নূতন শিক্ষাপদ্ধতি হইতে আমরা এইমাত্র আশা করিতে পারি যে কয়েকজনের নূতনপ্রকার চাকরি মিলিবে এবং কয়েকজন অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে কোনও প্রকার সুবিধা-লাভ হইবে না।

Technical educationকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল ইহাই বলিতে চাই—যদি ছাত্রগণ

অত্যধিক সংখ্যায় নির্বিচারে এই পথে জীবিকার সন্ধানে আসেন তবে তাঁহাদের অনেকেই বিফলমনোরথ হইবেন। কারণ, নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, এদেশে কারখানাও এত নাই যাহাতে যথেষ্ট চাকরি মিলিতে পারে। বিজ্ঞান সকলের রুচিকরও নয়। অতএব জীবিকালাভের অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা আর কিছু আছে কিনা দেখা উচিত।

বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের এক দল এদেশের কুলী মজুর ধোবা নাপিত কামার কুমার মাঝী মিস্ত্রীকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর এক দল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপ নেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্তি দেখিতেছে কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। এইসকল পরদেশী ইংরেজী বিদ্যা জানে না, economics বোঝে না, ইহাদের হিসাবের প্রণালীও আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট, অথচ বাণিজ্যলক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও খুব ব্যস্ত নয়, কারণ ইহারা মনে করে পণ্য উৎপাদন অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনাবেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্বিচারে দেশী বিলাতী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উপকারী অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার

হইতে ভোক্তার গৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত ঋজুকুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাটিতে দাঁড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙালী কতক ঈর্ষার বশে কত অজ্ঞতার জন্য এইসকল পরদেশীর কার্যপ্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্বর অশিক্ষিত দুর্নীতিপরায়ণ, টাকার জন্য দেশের সর্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটাকম্বল সম্বল করিয়া এদেশে আসে; যা-তা খাইয়া যেখানে সেখানে বাস করিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের তুল্য অর্থসঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদে নিঃস্ব। ভদ্র বাঙালী অত হীনভাবে জীবিকানির্বাহ আরম্ভ করিতে পারে না, তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না। অতএব দগ্ধোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

অনেক বৎসর পূর্বে ইংরেজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙালী ভাবিয়াছিল—ইংরেজের চালচলন অনুকরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে, বাঙালী বুঝিয়াছে মোটা চালচলনের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যমের কোনও বিরোধ নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জন দিতে হইবে।

যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এমন মনে করার কোনও হেতু নাই যে ঐসকল দোষের জন্যই তাহারা প্রতিযোগে জয়ী হইয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে বাঙালীর পরাভব তাহার নিজের ত্রুটির জন্যই হইয়াছে।

এইসকল পরদেশী বণিকের শিক্ষা ও পরিবেষ্টন সযত্ন অনুসন্ধানের যোগ্য। ইহারা জন্মাবধি বণিগ্‌বৃত্তির আবহাওয়ায় লালিত হইয়াছে এবং আত্মীয়স্বজনের নিকটেই দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বাঙালী কেরানী মার্চেণ্ট অফিসে গিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে invoice voucher day-book ledger লিখিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া আসে, মনিবের সহিত তাহার কেবল বেতনের সম্পর্ক। সে নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে মাত্র, মনিবের সমগ্র ব্যবসায় বুঝিবার তাহার সুযোগও নাই স্বার্থও নাই। ভারতীয় বণিকের অনেক কাজ গৃহেই নিষ্পন্ন হয়। তাহার সহায়তা করিয়া বণিকপুত্র অল্প বয়সেই পৈতৃক ব্যবসায়ের রস গ্রহণ করিতে শেখে, এবং কেনা বেচা আদায় উসুল জাবেদা রোকড় খতিয়ান হাতচিঠা হুণ্ডি মোকাম বাজারের গূঢ় তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এই business atmosphere বাঙালী ভদ্রের গৃহে দুর্লভ। উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রোফেসার কেরানীর সন্তান ইহাতে বঞ্চিত। বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বাঙালী ভদ্রের গৃহে নূতন করিয়া বপন করিতে হইবে। অনেক অঙ্কুর নষ্ট হইবে,

কিন্তু অভিভাবকের উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে ফলবান বিটপীও অচিরে দেখা দিবে।

দালাল আড়তদার ব্যাপারী পাইকার দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্তীর হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে আসে। পণ্যের এই পরিক্রমপথে অগণিত ব্যক্তির অন্নসংস্থান হয়। এই মহাজন-অনুসৃত পথই জীবিকার রাজপথ। বাঙালী ভদ্রলোককে এই পথের বার্তা সংগ্রহ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে।

আরম্ভ দুরূহ সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ অভিভাবকের উপদেশ পাইলে নূতন ব্রতীর পন্থা সুগম হইবে। কিন্তু যেখানে এ সুযোগ নাই সেখানেও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক অনেক সাহায্য করিতে পারেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাঙালী কুণ্ঠিত নয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় হয় তাহারই কিয়দংশে ব্যবসায় শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। অনেক উদার অভিভাবক এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিয়া বাঞ্ছিত ফল পান নাই, ভবিষ্যতেও অনেকে পাইবেন না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ও সকল সময়ে সার্থক হয় না।

সকল যুবকই অবশ্য ব্যবসায়ী হইবে না। কিন্তু যে হইতে চাহিবে তাহার সংকল্প স্থির করিয়া পঠদ্দশাতেই বণিগ্‌বৃত্তির সহিত পরিচয় আরম্ভ করা ভাল। এজন্য অধিক আড়ম্বর অনাবশ্যক। আগে অর্থবিদ্যা শিখিব তাহার পর ব্যবসায় আরম্ভ করিব এরূপ মনে করিলে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না।

আগে ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণ—ইহাই স্বাভাবিক রীতি। দোকান হাট বাজার আড়ত ব্যবসায়শিক্ষার সুগম বিদ্যাপীঠ। এইসকল স্থানে নিত্য যাতায়াত করিলে শিক্ষার্থী অনেক নূতন তথ্য শিখিবে; আমদানি, রপ্তানি, আড়তের বিক্রয়প্রথা, পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য, দালালের করণীয়, হিসাবের প্রণালী, পাওনা আদায়ের উপায়—ইত্যাদি বহু জটিল বিষয় সরল হইয়া যাইবে। অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর নিকট এইসকল সংবাদ গ্রহণ করেন তবে তিনিও উপকৃত হইবেন এবং শিক্ষার্থীকেও সাহায্য করিতে পারিবেন। সাধারণ শিক্ষা—অর্থাৎ স্কুল কলেজের শিক্ষা—শেষ হইলে শিক্ষার্থী দিনকতক কোনও ব্যবসায়ীর কর্মচারী হইয়া হাতেকলমে কাজ শিখিতে পারে। এদেশে ব্যবসায় শিখিবার জন্য premium দেওয়ার প্রথা নাই। কিন্তু যদি দিতেও হয় তাহা অপব্যয় হইবে না। যদি পছন্দমত কোনও নির্দিষ্ট ব্যবসায় শিখিবার সুযোগ না থাকে, তথাপি যেকোনও সমজাতীয় ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশি করায় লাভ আছে, কারণ সকল ব্যবসায়েরই কতকগুলি সাধারণ মূলসূত্র আছে। খুব বড় ব্যবসায়ীর অফিসে সুবিধা হইবে না। সেখানে নানা বিভাগের মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইবে, সমগ্র ব্যাপারে শৃঙ্খলিত ধারণা সহজে জন্মিবে না।

শিক্ষানবিশি শেষ হইলে সামান্য মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ হইতে পারে। সুবিধা হইলে অভিজ্ঞ অংশীদারের

সহিত বখরার বন্দোবস্ত হইতে পারে। অবশ্য প্রথম হইতেই জীবিকানির্বাহের উপযোগী লাভ হইবে না। কলেজে উচ্চ-শিক্ষা বা কার্যকরী বিদ্যা লাভ করিতে যে সময় লাগে, ব্যবসায় দাঁড় করাইতে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগিবে এরূপ আশা করা অসংগত। প্রথমে যে ছোট কারবার আরম্ভ হইবে তাহা হাতেখড়ি বলিয়াই গণ্য করা উচিত। তাহার পর অভিজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা জন্মিলে কারবার সহজেই বৃদ্ধি পাইবে।

এইপ্রকার শিক্ষার জন্য এবং সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে যে কষ্টসহিষ্ণুতা আবশ্যক, শৌখিন বাঙালীর ধাতে তাহা সহিবে কি? নিশ্চয় সহিবে। বাঙালী যুবক অশেষ পরিশ্রম করিয়া রাত জাগিয়া মড়া ঘাঁটিয়া ডাক্তারি শেখে। উত্তপ্ত লোহার ঘরে জ্বলন্ত হাপরের কাছে লোহা পিটিয়া এঞ্জিনিয়ারিং শেখে। প্রখর রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দমন করিয়া সার্ভেয়িং শেখে। আইনপরীক্ষা পাস করিয়া বহু দিন মুরব্বী উকিলের বাড়িতে ধরনা দেয়। ভোরে অর্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জার হইয়া সমস্ত দিন অফিসে কলম পিশিয়া বাড়ি ফেরে। এসকল কাজকে সে শ্লাঘ্য বা ভদ্রোচিত মনে করে সেজন্য কষ্ট সহিতে পারে। যেদিন সে বুঝিবে যে বণিগ্‌বৃত্তি হীন নয়, ইহাতে অতি উচ্চ আশা পূরণেরও সম্ভাবনা আছে, সেদিন সে এই বৃত্তির জন্য কোনও কষ্ট গ্রাহ্য করিবে না।

আশার কথা—পূর্বের তুলনায় বাঙালী এখন ব্যবসায়ে অধিকতর মন দিতেছে। আজকাল অনেক দেশহিতৈষী কুটীরশিল্প উন্নত কৃষি এবং কার্যকরী শিক্ষা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যদি বণিগ্‌বৃত্তির উপযোগিতার প্রতি মন দেন তবে অনেক যুবক উৎসাহিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। বণিগ্‌বৃত্তি সহজেই সংক্রামিত হয়, ইহার ক্ষেত্রও বিশাল। দোকানদার না থাকিলে সমাজ চলে না। জন-কতক অগ্রগামীর উদ্যম সফল হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্তী অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিবে। বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, নিপুণতা ও সৌষ্ঠবজ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এইসকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয় জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবী বাঙালীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহা কলমপেশার ফল নয়। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে তাহাও তাহার বৃত্তিজনিত নয়। অনেক বাঙালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের চর্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুখাইবে না।

১৩৩২

# রস ও রুচি

ঋগ্‌বেদের ঋষি আধ-আধ ভাষায় বললেন—'কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি'—অগ্রে যা উদয় হ'ল তা কাম। তারপর আমাদের আলংকারিকরা নবরসের ফর্দ করতে গিয়ে প্রথমেই বসালেন আদিরস। অবশেষে ফ্রয়েড সদলবলে এসে সাফ সাফ ব'লে দিলেন—মানুষের যাকিছু শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টি, কমনীয় মনোবৃত্তি, তার অনেকেরই মূলে আছে কামের বহুমুখী প্রেরণা।

সেদিন কোনও মনোবিদ্যার বৈঠকে একটি প্রবন্ধ শুনেছিলাম—রবীন্দ্রনাথের রচনার সাইকোঅ্যানালিসিস। বক্তা পরমশ্রদ্ধাসহকারে রবীন্দ্রসাহিত্যের হাড় মাস চামড়া চিরে চিরে দেখাচ্ছিলেন কবির প্রতিভার মূল উৎস কোথায়। কবি যদি সেই ভৈরবীচক্রে উপস্থিত থাকতেন তবে নিশ্চয় মূর্ছা যেতেন, আর মূর্ছান্তে ছুটে গিয়া কোনও স্মৃতিভূষণকে ধ'রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতেন।

কি ভয়ানক কথা! আমরা যাকিছু স্পৃহণীয় বরেণ্য পরম উপভোগ্য মনে করি তার অনেকেরই মূলে আছে একটা হীন রিপু! ফ্রয়েডের দল খাতির ক'রে তার নাম দিয়েছেন 'লিবিডো', কিন্তু বস্তুটি লালসারই একটি বিরাট রূপ। তাও কি সোজাসুজি লালসা? তার শতজিহ্বা শতদিকে লকলক করছে, সে দেবতার ভোগ শকুনির উচ্ছিষ্ট একসঙ্গেই চাটতে

চায়, তার পাত্রাপাত্র কালাকাল জ্ঞান নেই। এই জঘন্য বৃত্তিই কি আমাদের রসজ্ঞানের প্রসূতি? 'পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'—মনে করতাম এই কথাটি ভগবানকে খুশী করবার জন্য একটু অতিরঞ্জিত বিনয়বচন মাত্র। আমরা যে সত্য সত্যই এমন উৎকট পাপাত্মা তা এতদিন হুঁশ হয় নি। বিধাতা আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নরকস্থ করেছেন, আমাদের আবার সুরুচি কুরুচি!

ছটা রিপুর মধ্যে প্রথমটারই অত প্রতিপত্তি হ'ল কেন? কাব্য সাহিত্য চৌষট্টি-কলা ভক্তি প্রেম স্নেহ সমস্তই কামজ; অতি উত্তম কথা। কিন্তু ক্রোধ থেকে কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যায় নি কি? গীতাকার কাম-ক্রোধকে একাকার ক'রে বলেছেন—'কাম এষ, ক্রোধ এষ'। লোভ মোহ প্রভৃতি অন্য রিপুও বোধ হয় তাঁর মতে কামের রূপান্তর। ফ্রয়েডের শিষ্যরা গীতার একটা সরল ব্যাখ্যা লিখলে ভাল হয়।

আর একটা সংশয় আমাদের মতন আনাড়ীদের মনে উদয় হয়।—বৈদিক ঋষি থেকে ফ্রয়েডপন্থী পর্যন্ত সকলেই হয়তো একটা ভুল করেছেন। আগে কাম, না আগে ক্ষুধা? পাচনরসই আদিরস নয়তো? কাম-কমপ্লেক্স্ যেমন নব নব মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে ফুটে ওঠে, ক্ষুৎ-কমপ্লেক্সেরও কি তেমন কোনও ক্ষমতা নেই?

আধুনিক 'মনোজ্ঞ'গণ বলেন—অতৃপ্তি বা নিগ্রহেই কামের রূপান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, আর তার ফল এই বিচিত্র মানবচরিত্র।

ভোজনেরও অতৃপ্তি আছে, কিন্তু সে অতৃপ্তি তেমন তীব্র নয়, সেজন্য মানুষের মনে তার প্রভাব অল্প। অর্থাৎ উপবাসের চেয়ে বিরহেরই সৃষ্টিশক্তি বেশী। অবশ্য ‘বিরহ’ শব্দটির একটু ব্যাপক অর্থ ধরতে হবে; ন্যায্য অন্যায্য পবিত্র পাশবিক অস্বাভাবিক সমস্ত অতৃপ্তিই বিরহ, আর তা মনের অগোচরেই কাজ করে।

ক্ষুৎ-কমপ্লেক্সের যে কিছুই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই এমন নয়। শোনা যায় সেকালে অনেকে খানা খাবার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন, অবশ্য তাঁরা অপরকে এবং নিজেকে আধ্যাত্মিক হেতুই দেখাতেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার ক'রে গেছেন তিনি তুচ্ছ পাউরুটির লোভে দিনকতক সনাতন সমাজ বর্জন ক'রেছিলেন। এখনকার ভদ্র হিন্দুধর্ম অতি উদার—অন্তত খাওয়া-পরা সম্বন্ধে, সেজন্য লুব্ধ রসনা থেকে মনে আর ধর্মরসের সঞ্চার হয় না। কিন্তু বিবাহে যেটুকু বাধা আছে তা এখনও সমাজে আর উপন্যাসে অঘটন ঘটাচ্ছে।

সাহিত্যে ভোজনরসের প্রতিপত্তি নেই। কলিদাসের যক্ষ শুধু বিরহী নয়, উপবাসীও বটে। সে অলকাপুরীর হরেক রকম ভোগের বর্ণনা করেছে, কিন্তু সেখানকার বাবুর্চী-খানার কথা কিছুই বলে নি। রবীন্দ্রনাথও এ রসের প্রতি বিমুখ, কিন্তু তিনি এর প্রভাব একবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কমলার উপর গাজীপুরযাত্রী খুড়োমশায়ের হঠাৎ যে স্নেহ হ'ল তার মূলে কোন্ কমপ্লেক্স্ ছিল? খুড়োর বয়স

হয়েছে, কিন্তু ভোজনব্যাপারে তিনি উদাসীন নন। স্টীমারে রান্নার সুবাস পেয়ে বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস টেনে বলছেন—'চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে'। তরুণ যেমন অচেনা তরুণীর একটু হাসি একটু কাশি একটু হাঁচি অবলম্বন ক'রে ভবিষ্য দাম্পত্য-জীবনের স্বপ্ন রচনা করে, এই বৃদ্ধও তেমনি কমলার ফোড়নের গন্ধে ভবিষ্য ব্যঞ্জনপরম্পরা কল্পনা ক'রে অনাথা মেয়েটির স্নেহে বাঁধা পড়েছিলেন। ফ্রয়েডের শিষ্য নিশ্চয় অন্য ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু আমরা কানে আঙুল দিয়ে রইলাম।

ভোজনরস এখন থাকুক, যে রস মানুষের মনে প্রবলতম তার কথাই হোক। কামের পরিবর্তনের ফলে যদি আমরা প্রেম ভক্তি স্নেহ কলা কাব্য প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস পেয়ে থাকি, তবে কিসের খেদ? রসগ্রাহী ভদ্রজন ফুল চায়, ফল চায়, গাছের গোড়ায় কিসের সার আছে তার খোঁজ করে না। নীরস বিজ্ঞানী গাছের গোড়া খুঁড়ে দেখুক, সারের ব্যবস্থা করুক, তাতে আপত্তি নেই। পচা জৈব সারে গাছ সতেজ হয়—এটা খাঁটী সত্য কথা। কিন্তু ফুল ফল উপভোগ করবার সময় কেউ তাতে সার মাখায় না।

কিন্তু অতীব লজ্জাসহকারে স্বীকার করতে হবে যে কেবল ফুল ফলে তৃপ্তি হয় না, গাছের গোড়ায় যে জীবনীয় রস আছে তার আস্বাদও আমরা মাঝে মাঝে কামনা করি। সামাজিক জীবনে যা ঘৃণ্য বা পীড়াদায়ক, এমন অনেক বস্তু নিপুণ রসস্রষ্টার রচিত হ'লে আমরা সমাদরে উপভোগ করি। নতুবা

শোক দুঃখ নিষ্ঠুরতা লালসা ব্যাভিচার প্রভৃতির বর্ণনা কাব্যে গল্পে চিত্রে স্থান পেত না।

আসল কথা—আমাদের বহু কামনা নানা কারণে আমাদের অন্তরের গোপন কোণে নির্বাসিত হয়েছে, এবং তাদের অনেকে উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে হৃদয় ফুঁড়ে বার হয়েছে। এতেই তাদের চরিতার্থতা। এইসকল মনোবৃত্তি সমাজের পক্ষে হিতকর, তাই সমাজ তাদের সযত্নে পোষণ করে, এবং সাহিত্যাদি কলায় তারা অনবদ্য ব'লে গণ্য হয়। কিন্তু যেসব কামনার তেমন রূপান্তরগ্রহের শক্তি নেই তারা মাটিচাপা প'ড়েও অহরহ ঠেলা দিচ্ছে। সমাজ বলছে—খবরদার, যদি ফুটতেই চাও তবে কমনীয় বেশে ফুটে ওঠ। কিন্তু নিগৃহীত কামনা বলছে—ছদ্মবেশে সুখ নেই, আমি স্বমূর্তিতেই প্রকট হ'তে চাই; আমি পাষাণকারা ভাঙব, কিন্তু করুণাধারা ঢালা আমার কাজ নয়। হুশিয়ার রসস্রষ্টা স্নেহশীল পিতার ন্যায় তাদের বলেন—বাপু-সব, তোমাদের একটু রৌদ্রে বেড়িয়ে আনব, কিন্তু সাজগোজ ক'রে ভদ্রবেশ ধ'রে চল; আর, বেশী দাপাদাপি ক'রো না। তৃষিত রসজ্ঞজন তাদের দেখে বলেন—আহা, কাদের বাছা তোমরা? কি সুন্দর, কিন্তু কেউ কেউ যেন একটু বেশী দুরন্ত। তাদের স্রষ্টা বুঝিয়ে দেন—এরা তোমার নিতান্তই অন্তরের ধন; ভয় নেই, এরা কিছুই নষ্ট করবে না, আমি এদের সামলাতে জানি; এদের মধ্যে যে বেশী দুরন্ত তাকে আমি অবশেষে ঠেঙিয়ে দুরস্ত;

ক'রে দেব, যে কম দুরন্ত তাকে অনুতপ্ত করব, যে কিছুতেই বাগ মানবে না তাকে নিবিড় রহস্যের জালে জড়িয়ে ছেড়ে দেব। দ্রষ্টার দল খুশী হয়ে বলেন—বাঃ, এই তো আর্ট। কিন্তু দুএকজন অরসিক এত সাবধানতা সত্ত্বেও ভয় পান।

আর একদল রসস্রষ্টা তাঁদের আত্মজের প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহশীল। তাঁরা এইসব নিগৃহীত কামনাকে বলেন—কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? অত সাজগোজের দরকার কি, যাও, উলঙ্গ হয়ে রং মেখে নেচে এস। জনকতক লোলুপ রসলিপ্সু তাদের সমাদরে বরণ ক'রে বলছেন—এই তো আসল আর্ট, আদিম ও চরম। কিন্তু সংযমী দ্রষ্টার দল বলেন—কখনও আর্ট নয়, আর্টে আবিলতা থাকতে পারে না; আর্ট যদি হবে তবে ওদের দেখে আমাদের এতজনের অন্তরে এমন ঘৃণা জন্মায় কেন? সমাজপতিরা বলেন—আর্ট-ফার্ট বুঝি না; সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হ'তে দেব না; আমাদের সব বিধানই যে ভাল এমন বলি না; যদি উৎকৃষ্টতর বিধান কিছু দেখাতে পার তো দেখাও; কিন্তু তা যদি না পার তবে আত্মস্ফূর্তি বা self-expression-এর দোহাই দিয়ে যে তোমরা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করবে, আমাদের ছেলেমেয়ে বিগড়ে দেবে, সেটি হবে না; আমরা আছি, পুলিসও আছে।

উক্ত দুই দল রসস্রষ্টার মাঝে কোনও গণ্ডি নেই, আছে কেবল মাত্রাভেদ বা সংযমের তারতম্য। ক্ষমতার কথা ধরব না, কারণ অক্ষম শিল্পীর হাতে স্বর্গের চিত্রও নষ্ট হয়, গুণীর

হাতে নরকবর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী হয়। কোন্ সীমায় সুরুচির শেষ আর কুরুচির আরম্ভ তারও নির্ধারণ হ'তে পারে না। এক যুগ এক দল যাকে উত্তম আর্ট বলবে, অপর যুগ অপর দল তার নিন্দা করবে, আর সমাজ চিরকালই আর্ট সম্বন্ধে অনধিকারচর্চা করবে।

বিধাতার রচনা জগৎ, মানুষের রচনা আর্ট। বিধাতা একা, তাই তাঁর সৃষ্টিতে আমরা নিয়মের রাজত্ব দেখি। মানুষ অনেক, তাই তার সৃষ্টি নিয়ে এত বিতণ্ডা। এই সৃষ্টির বীজ মানুষের মনে নিহিত আছে, তাই বোধ হয় প্রতীচ্য মনোবিদের 'লিবিডো' আর ঋষিপ্রোক্ত 'কাম'—

কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।

( ঋগ্‌বেদ, ১০ম. ১২৯ সূ )

কামনার হ'ল উদয় অগ্রে, যা হ'ল প্রথম মনের বীজ।
মনীষী কবিরা পর্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।

( শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কৃত অনুবাদ )

ঋষি অবশ্য বিশ্বসৃষ্টির কথাই বলছেন, এবং 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থই ধরতে হবে। কিন্তু সৎ-অসৎ-এর বাংলা অর্থ ধরলে এই সূক্তটি আর্ট সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য। ফ্রয়েডপন্থীর সিদ্ধান্ত অনুসারে অসদ্‌বস্তু কাম থেকে সদ্‌বস্তু

আর্ট উৎপন্ন হয়েছে। মনীষী কবিরা নিজ নিজ হৃদয় পর্যালোচনা ক'রে হয়তো আপন অন্তরে আর্টের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু জনসাধারণের উপলব্ধি এখনও অস্ফুট। কি আর্ট, আর কি আর্ট নয়—বিজ্ঞান আজও নিরূপিত করতে পারে নি, অতএব সুরুচি কুরুচি সুনীতি দুর্নীতির বিবাদ আপাতত চলবেই। যদি কোনও কালে আর্টের লক্ষণ নির্ধারিত হয়, তাহ'লেও সমাজের শঙ্কা দূর হবে কিনা সন্দেহ।

রস কি তা আমরা বুঝি কিন্তু বোঝাতে পারি না। আর্টের প্রধান উপাদান রস, কিন্তু তার অন্য অঙ্গও আছে তাই আর্ট আরও জটিল। চিনি বিশুদ্ধ রসবস্তু, কিন্তু শুধু চিনি তুচ্ছ আর্ট। চিনির সঙ্গে অন্যান্য রসবস্তুর নিপুণ মিলনই আর্ট। কিন্তু যেসব উপাদান আমরা হাতের কাছে পাই তার সবগুলি অখণ্ড রসবস্তু নয়, অল্পবিস্তর অবাস্তর খাদ আছে। নির্বাচনের দোষে মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অতিরিক্ত বাজে উপাদান এসে পড়ে, অভীষ্ট স্বাদে অবাঞ্ছিত স্বাদ জন্মায়। তার উপর আবার ভোক্তার পূর্ব অভ্যাস আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে, ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ আছে। এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, ভোক্তার রুচি গঠিত ক'রে, কল্যাণের অন্তরায় না হয়ে, যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

১৩৩৪

# অপবিজ্ঞান

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল—'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ ক'রে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একবারে লোপ পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে'। এই অপূর্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্তলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন? বিলাতী খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপন মায় প্রশংসাপত্র বাহির হইতেছে। সাহেবরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়, অতএব তোমার আমার অশ্রদ্ধার কোনও হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস—মিছরি নিম এবং ভাইটামিনের তুল্য বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হউক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন্ রোগে কি রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না, সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী। অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা—ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর-স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউণ্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে

নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দ। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা—সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাচের চুড়ি বর্জন করিলেন তখন একটি অপূর্ব স্বদেশী পণ্য দেখা দিয়াছিল—'আলুর চুড়ি'। ইহা বিলাতী সেলিউলয়েডের পাত জুড়িয়া প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিলাতী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর বাহির হয়। বহুকালপূর্বে কোনও কাগজে পড়িয়াছিলাম গন্ধকাম্লে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় তাহা হইতেই আলুর চুড়ি নামটি রটিয়াছিল।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে—'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ—রাংএর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন, সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও .অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে। বাংলা মাসিকপত্রিকার জিজ্ঞাসাবিভাগের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন—বাতাস করিতে করিতে গায়ে পাখা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে চান। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসাবিভাগে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায় ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন—আলবৎ জন্মায়, ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই লইয়া কয়েক মাস তুমুল বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে হইল, সম্পাদক

মহাশয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মত প্রকাশ করিলেন—পুদিনা জন্মায় না।

আর একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কর্পূর উবিয়া যায় কেন। উত্তর অনেক আসিল, সকলেই বলিলেন কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ তাই উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা বোধ হয় তৃপ্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি আর জেরা করেন নাই। কিন্তু উত্তরটি কৌতুককর। 'উদ্বায়ী'র অর্থ—যাহা উবিয়া যায়। উত্তরটি দাঁড়াইল এই—কর্পূর উবিয়া যায়, কারণ তাহা এমন বস্তু যাহা উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিলেন। একবার এক গ্রাম্য যুবককে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছিলাম—কুইনীনে জ্বর সারে কেন। একজন মুরব্বী ব্যক্তি বুঝাইয়া দিলেন—কুইনীন জ্বরকে জব্দ করে, তাই জ্বর সারে।

কর্পূর উবিয়া যায় কেন, ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলিবেন—জানি না। হয়তো কালক্রমে নির্ধারিত হইবে যে পদার্থের আণব সংস্থান অমুকপ্রকার হইলে তাহা উদ্বায়ী হয়। তখন বলা চলিবে—কর্পূরের গঠনে অমুক বিশিষ্টতা আছে তাই উবিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও প্রশ্ন থামিবে না, ঐপ্রকার গঠনের জন্যই বা পদার্থ উদ্বায়ী হয় কেন? বিজ্ঞানী পুনর্বার বলিবেন—জানি না।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয়

সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রেই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রেই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

কারণনির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে এবং কর্পূরের প্রশ্নোত্তরে কোনও প্রভেদ নাই, হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খবর রাখেন। তিনি বলিতে চান—অনেক জিনিসই উবিয়া যায়, কর্পূর তাহাদের মধ্যে একটি; জড়পদার্থ মাত্রেই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী কর্তৃক ফল আকর্ষণ তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু কারণ-নির্দেশ হইল না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে-সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপার-পরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি অতিপরিচিত বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ। ইহা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দান নয়, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিবাদ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।

বহুযুগের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের দূরদৃষ্টি জন্মিয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপারপরম্পরা সে নির্ণয় করিতে পারে। কিসে কি হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ আয়ত্ত, শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনায়ত্ত। যাহা দৃষ্ট তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।

নিয়তিবাদী দার্শনিক বলেন—কিসে কি হইবে তাহা জগতের উৎপত্তির সঙ্গেই নিয়মিত হইয়া আছে, সমস্ত ব্যাপারই নিয়তি। মানুষের সাধ্য অসাধ্য সমস্তই নিয়তি, আমরা নিয়তি অনুসারেই পুরুষকার প্রয়োগ করি। কাজ সহজে উদ্ধার হইয়া গেলে নিয়তির কথা মনে আসে না। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইলেই মনে পড়ে, নিয়তি মানুষের অবাধ্য, যত্ন করিলেও সব কাজ সিদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞানও স্বীকার করে—এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত এবং অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যদ্বুক্তি করিতে পারেন, যথা—অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের শীঘ্র জেল হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে বলিয়াই পারেন। বিচক্ষণ দাবা-খেলোয়াড় ভবিষ্যতের পাঁচ ছয় চাল হিসাব করিয়া ঘুঁটি চালিয়া থাকে। কিন্তু যাহা মানুষের প্রতর্ক্য বা অনুমানগম্য তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধ্য বা প্রতিকার্য নয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যে চন্দ্রের গ্রহণ রোধ করি, কিন্তু এমন শক্তি থাকিতে পারে যাহাতে অমুকের কারাদণ্ড নিবারণ করা যায়। এমন প্রাজ্ঞ যদি কেহ থাকেন যিনি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন, তবে তিনি সর্বদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার কাছে নিয়তি 'অদৃষ্ট' নয়, দৃষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি মানুষ, তাই সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, কিন্তু অন্য মানুষের তুলনায় তাঁহার সাধ্যের সীমা অতি

বৃহৎ। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজ এইরূপে উত্তরোত্তর অনাগতবিধাতা হইতেছে।

কূট তার্কিক বলিবেন—প্রকৃতির অখণ্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই আর তিনে পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর দেন—তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্য প্রকার দেখিব তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বিজ্ঞানী যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনও কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।

অতএব, অদৃষ্টের অর্থ—অনির্ণেয় ও অসাধ্য ঘটনাসমূহ; নিয়তির অর্থ—সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব। ঘটনার কারণ অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে অদৃষ্টকে অনর্থক টানিয়া আনিয়া সুখদুঃখের ব্যাখ্যা করে। জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, কিংবা যদি কোনও পরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ বড়লোক হয়, তখনই মনে কষ্টকর প্রশ্ন আসে—কেন এমন হইল? বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন—বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না? সমস্তই অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, নিয়তি। অমুক লোকটি মরিল কেন,

ইহার উত্তরে যদি বলা হয়—কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স—তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা—মরণের অনির্ণেয়তা বা অবার্যতাই মরিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism তাহা শুনিলে কাহারও কৌতূহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনা-লাভ হয় না, সুতরাং ইহাও বলা বৃথা—অমুক লোকটি ঘটনা-পরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক Poyintingএর এই উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য।—
'No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe.....A law of nature explains nothing—it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.'

১৩৩৬

# ঘনীকৃত তৈল

চলিত কথায় 'তৈল' বলিলে যেসকল বস্তু বুঝায় তাহাদের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। সকল তৈলই দাহ্য, অল্পাধিক তরল এবং জলে অদ্রাব্য। তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈলে এইসকল লক্ষণ বর্তমান। পক্ষান্তরে স্পিরিট তৈল নয়, কারণ তাহা দাহ্য ও তরল হইলেও জলের সহিত মিশে।

কিন্তু তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈলের কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে। তার্পিন সহজে উবিয়া যায়, কেরোসিন উবিতে সময় লাগে, সর্ষপ তৈল মোটেই উবে না। সর্ষপ তৈলের সহিত সোডা মিশাইয়া সাবান করা যায়, কিন্তু তার্পিন ও কেরোসিনে সাবান হয় না।

আমরা মোটামুটি কাজ চালাইবার জন্য পদার্থের স্থূল লক্ষণ দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করি, কিন্তু বিজ্ঞানী তাহাতে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখেন কোন্ লক্ষণগুলি পদার্থের গঠন ও ক্রিয়ার পরিচায়ক, এবং সেই-গুলিকেই মুখ্য লক্ষণ গণ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করেন। শ্রেণী-নির্দেশের জন্য বিজ্ঞানী নূতন নাম রচনা করেন, অথবা প্রচলিত নাম বজায় রাখিয়া তাহার অর্থ সংকুচিত বা প্রসারিত করেন। এজন্য লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে অনেক স্থলে

বিরোধ দেখা যায়। লোকে বলে চিংড়ি-মাছ, বিজ্ঞানী বলেন চিংড়ি মাছ নয়। লোকে কয়েকপ্রকার লবণ জানে, যথা—সৈন্ধব, করকচ, লিভারপুল, বেআইনী, ইত্যাদি। বিজ্ঞানী বলেন, লবণ তোমার রান্নাঘরের একচেটে নয়, লবণ অসংখ্য, ফটকিরি তুঁতেও লবণ। কবি লেখেন—তাল-তমাল। বিজ্ঞানী বলেন—ও তুই গাছে ঢের তফাত, বরং ঘাস-বাঁশ লিখিতে পার।

রসায়নশাস্ত্র অনুসারে তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈল তিন পৃথক শ্রেণীতে পড়ে। তার্পিন, চন্দন, নেবুর তৈল প্রভৃতি গন্ধতৈল প্রথম শ্রেণী। কেরোসিন, পেট্রল, ভ্যাসেলিন, এমন কি কঠিন প্যারাফিন—যাহা হইতে বর্মা-বাতি হয়, দ্বিতীয় শ্রেণী। সর্ষপ তৈল, তিল তৈল, ঘৃত, চর্বি প্রভৃতি উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ স্নেহদ্রব্য তৃতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ ইংরেজী নাম fat; আমরা এই শ্রেণীকেই 'তৈল' নামে অভিহিত করিব। অপর তুই শ্রেণী এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়।

তৈল মানুষের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। ভারতের প্রদেশভেদে সর্ষপ তিল চীনাবাদাম ও নারিকেল তৈল রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতের তো কথাই নাই, ভারতবাসী মাত্রই ঘৃতভক্ত। চর্বির ভক্তও অনেক আছে। কার্পাসবীজের তৈলও আজকাল রন্ধনে চলিতেছে। কোনও কোনও স্থানে তিসির তৈলও বাদ যায় না। মাদ্রাজে রেড়ির তৈলে প্রস্তুত উপাদেয় আমের আচার খাইয়াছি।

সাধারণ সাবানের উপাদান তৈল ও সোডা। তৈলভেদে সাবানের গুণের তারতম্য হয়। চর্বি ও নারিকেল তৈলের সাবান শক্ত, রেড়ি তিল চীনাবাদাম প্রভৃতি তৈলের সাবান নরম। লোকে নরম সাবান পছন্দ করে না, সেজন্য অন্য তৈলের সহিত কিছু চর্বি ও নারিকেল তৈল মিশানো হয়। নারিকেল তৈলের বিশেষ গুণ—সাবানে প্রচুর ফেনা হয়। কোনও কোনও কাজে নরম সাবানই দরকার হয়, সেজন্য নারিকেল তৈল ও চর্বি না দিয়া অন্য উদ্‌ভিজ্জ তৈল বা মাছের তৈল ব্যবহার করা হয় এবং সোডার বদলে অল্পাধিক পটাশ দেওয়া হয়। কিন্তু মোটের উপর কঠিন সাবানেরই আদর বেশী, সেজন্য চর্বি ও নারিকেল তৈলের কাটতি• ক্রমে বাড়িতেছে।

কলের তাঁতে বুনিবার পূর্বে সুতায় যে মাড় দেওয়া হয় তাহার একটি প্রধান উপকরণ চর্বি। আমাদের দেশের তাঁতীরা নারিকেল তৈল দেয়, কিন্তু মিলে চর্বিই প্রকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণেও চর্বির মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে।

লুচি কচুরি প্রস্তুত করিবার সময় ময়দায় ঘিএর ময়ান দেওয়া হয়, তাহার ফলে খাবার খাস্তা হয়, অর্থাৎ ময়দাপিণ্ডের চিমসা ভাব দূর হয়। খাজা, ঢাকাই পরটা প্রভৃতিতে প্রচুর ময়ান থাকে, সেজন্য ভাজিবার সময় স্তরে স্তরে আলগা হইয়া যায়। কিন্তু যদি ঘিএর বদলে তেলের ময়ান দেওয়া হয় তবে তত ভাল হয না। চর্বি দিলে ঘিএর চেয়েও ভাল হয়, অবশ্য

সকলে সে পরীক্ষা করিতে রাজী হইবে না। বিলাতী বিস্কুটে এযাবৎ চর্বির ময়ান চলিয়া আসিতেছে। এদেশে যে 'হিন্দু-বিস্কুট' প্রস্তুত হয় তাহা বিলাতীর সমকক্ষ নয়। ইহার প্রধান কারণ—নিপুণতার অভাব, কিন্তু চর্বির বদলে ঘি বা মাখন ব্যবহারও অন্যতম কারণ।

তৈল চর্বি ইত্যাদির যতরকম প্রয়োগ আছে তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখন ঘনীকৃত তৈলের কথা পাড়িব।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন ফরাসী রসায়নবিৎ আবিষ্কার করেন যে নিকেল-ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সাহায্যে তৈলের সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস যোগ করা যায়, তাহার ফলে তরল তৈল ঘনীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিকেল অনুঘটকের (catalyst) কাজ করে মাত্র, উৎপন্ন বস্তুর অঙ্গীভূত হয় না। উক্ত আবিষ্কারের পর বহু বিজ্ঞানী এই প্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহার ফলে একটি বিশাল ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

যে-কোনও তৈল এই উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে ঘৃতের তুল্য কোমল, চর্বির তুল্য [illegible], মোমের তুল্য কঠিন অথবা তদপেক্ষাও কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়। সর্ষপ তৈল, নিম তৈল, এমন কি পূতিগন্ধ মাছের তৈল পর্যন্ত বর্ণহীন গন্ধহীন ঘন বস্তুতে পরিণত হয়।

Hydrogenated oil বা solidified oil বা ঘনীকৃত তৈল এখন ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে হলাণ্ড মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইংলাণ্ডও ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। এতদিন চর্বি দ্বারা যে কাজ হইত, এখন বহুস্থলে ঘনীকৃত তৈল দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতেছে। যেসকল উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল পূর্বে অতি নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য বলিয়া গণ্য হইত, এখন তাহাদেরও সদ্‌গতি হইতেছে।

রুটি-মাখন বিলাতের জনপ্রিয় খাদ্য। কিন্তু গরিব লোকে মাখনের খরচ যোগাইতে পারে না, সেজন্য 'মারগারিন' নামক কৃত্রিম মাখনের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে ইহার উপাদান ছিল—চর্বি, উদ্‌ভিজ্জ তৈল, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ এবং ঈষৎ মাত্রায় পিষ্ট-গোস্তনের নির্যাস। শেষোক্ত উপাদান মিশ্রণের ফলে মারগারিনে মাখনের স্বাদ ও গন্ধ কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভাল মারগারিনে কিছু খাঁটী মাখনও মিশ্রিত থাকে। আজকাল যে মারগারিন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে চর্বি ও স্বাভাবিক উদ্‌ভিজ্জ তৈল প্রায় থাকে না, তৎপরিবর্তে মাখনের তুল্য ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হয়, কিন্তু অন্যান্য উপাদান পূর্ববৎ বজায় আছে। চকোলেট টফি প্রভৃতি খাদ্যে পূর্বে মাখন দেওয়া হইত, এখন প্রায় ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে লাভ বাড়িয়াছে এবং বিকৃতির আশঙ্কাও কমিয়াছে। বিস্কুটেও ক্রমশ চর্বির বদলে ঘনীকৃত তৈল চলিতেছে, সেজন্য কোনও

কোনও ব্যবসায়ী সগর্বে বলিতেছেন—তাঁহাদের জিনিস খাইলে হিন্দু-মুসলমানের জাতি যায় না। সাবান ও অন্যান্য বহু ব্যবসায়ে ঘনীকৃত তৈলের প্রয়োগ ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে। মোট কথা, বিশেষ বিশেষ কর্মের উপযুক্ত অনেকপ্রকার ঘনীকৃত তৈল প্রস্তুত হইতেছে এবং লোকেও তাহার প্রয়োগ শিখিতেছে।

এই নূতন বস্তুর ব্যবহার কয়েক বৎসর পূর্বে ইউরোপ ও আমেরিকাতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িগণ নব নব ক্ষেত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরে দৃষ্টি পড়িল এই দেশের উপর। ভারতগাভী সর্বদা হাঁ করিয়া আছে, বিলাতী বণিক যাহা মুখে গুঁজিয়া দিবে তাহাই নির্বিচারে গিলিবে এবং দাতার ভাণ্ড দুগ্ধে ভরিয়া দিবে। অতএব বিশেষ করিয়া এই দেশের জন্য এক অভিনব বস্তু সৃষ্ট হইল—'vegetable product' বা 'উদ্ভিজ্জ পদার্থ'। ব্যবসায়িগণ প্রচার করিলেন—ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না, ধর্মহানি হয় না, এবং পবিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ ইহার মার্কা দিলেন—মহীরুহ বা পদ্মকোরক বা নবকিশলয়। ভারতের জঠরাগ্নি এই বিজ্ঞানসম্ভূত হবির আহুতি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল, হালুইকর ও হোটেলওয়ালা মহানন্দে স্বাহা বলিল, দরিদ্র গৃহস্থবধূ লুচি ভাজিয়া কৃতার্থ হইল। দেশের সর্বত্র এই বস্তু ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইতেছে এবং শীঘ্রই পল্লীর ঘরে ঘরে কেরোসিন তৈলের ন্যায় বিরাজ করিবে এমন লক্ষণ দেখা

যাইতেছে। আজকাল বহুস্থলে ভোজের রন্ধনে ঘৃতের সহিত আধাআধি ইহা চলিতেছে। ধর্মভীরু ঘিওয়ালার কুণ্ঠা দূর হইয়াছে, এখন আর চর্বি ভেজাল দিবার দরকার হয় না, মহীরুহ-মার্কা মিশাইলেই চলে। সুদূর পল্লীতে অনেক গোয়ালার ঘরে খোঁজ করিলে এই জিনিসের টিন মিলিবে। ঘি ভেজালের প্রথম পর্ব এখন গোয়ালার ঘরেই নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু এত গুণ এত সুবিধা সত্ত্বেও এই দ্রব্যের বিরুদ্ধে কয়েকজন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউনসিলে এ সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ঘনীকৃত তৈলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার মর্ম এই।—

সপক্ষ বলেন—খাঁটী ঘি নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিস, তাহার সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিতেছি না। কিন্তু সকলের ঘি খাইবার সংগতি নাই। অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে যাহা তেল দিয়া তৈয়ারি করিলে ভাল হয় না, যথা লুচি কচুরি গজা মিঠাই চপ। এইসকল দ্রব্য ভাজিবার জন্য বাজারের ভেজাল ঘিএর বদলে অপেক্ষাকৃত সস্তা অথচ নির্দোষ ঘনীকৃত তৈল ব্যবহার করিবে না কেন? ইহাতে ভাল ঘিএর সুগন্ধ নাই সত্য, কিন্তু দুর্গন্ধও নাই, এমন কি কোনও গন্ধই নাই। ইহাতে খাবার ভাজিলে তেলে-ভাজা বলিয়া বোধ হয় না, বরং ঘিএ-ভাজা বলিয়াই ভ্রম হয়, অথচ বাজারের ঘিএর দুর্গন্ধ অনুভূত

হয় না। ঘিএর উপর ভারতবাসীর যে প্রবল আসক্তি আছে তাহা অন্য তেলে মিটিতে পারে না, কিন্তু নির্গন্ধ ঘনীকৃত তৈলে বহুপরিমাণে মিটিবে। সাধারণ লোকের ঘিএর উপর লোভ আছে কিন্তু পয়সা নাই, সেজন্যই ভেজাল ঘি চলিতেছে। দূষিত চর্বিময় ভেজাল ঘি না খাইয়া নির্দোষ ঘনীকৃত তৈল খাইলে স্বাস্থ্য ও ধর্ম উভয়ই রক্ষা পাইবে। যদি ঘৃতের সুগন্ধ চাও, তবে ঘনীকৃত তৈলের সহিত কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ঘৃত মিশাইয়া লইতে পার, বাজারের ঘি খাইয়া আত্মবঞ্চনা করিও না।

বিপক্ষ বলেন—ভেজাল ঘি খুবই চলে ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু ঘনীকৃত তৈলের আমদানির ফলে ঐ ভেজাল বাড়িয়াছে এবং আরও বাড়িবে। ভেজাল ঘিএ চর্বি চীনাবাদাম তৈল ইত্যাদির মিশ্রণ যত সহজে ধরা যায়, ঘনীকৃত তৈলের মিশ্রণ তত সহজে ধরা যায় না। যাহারা সজ্ঞানে বা চক্ষু মুদিয়া সস্তায় ভেজাল ঘি কেনে তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা সাবধানতার ফলে এপর্যন্ত প্রবঞ্চিত হয় নাই, এখন তাহারাও অজ্ঞাতসারে ভেজাল কিনিতেছে। মাখন গলাইলেও বিশ্বাস নাই, কারণ তাহাতেও মারগারিন আকারে ঘনীকৃত তৈল প্রবেশ করিয়াছে। আর এক কথা—ঘৃতে ভাইটামিন আছে, ঘনীকৃত তৈলে নাই, অতএব ঘৃতের পরিবর্তে ঘনীকৃত তৈলের চলন বাড়িলে লোকের স্বাস্থ্যহানি হইবে। আর, যতই বৃক্ষ লতা ফল ফুলের মার্কা

দাও এবং উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ বলিয়া প্রচার কর, উহা যে অতি সস্তা মাছের তেল হইতে প্রস্তুত নয় তাহারই বা প্রমাণ কি? বিলাতী ব্যবসাদার মাত্রেই তো ধর্মপুত্র নয়। আরও এক কথা—ঘনীকৃত তৈলে ঈষৎ মাত্রায় নিকেল ধাতু দ্রবীভূত থাকে, রাসায়নিকগণ তাহা জানেন। তাহাতে কালক্রমে স্বাস্থ্যহানি হয় কিনা কে বলিতে পারে?

এই বিতর্ক লইয়া বেশী মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। দূরদর্শী দেশহিতৈষী মাত্রেই বুঝিবেন—বিদেশী ঘনীকৃত তৈল সর্বথা বর্জনীয়। কেবল একটা কথা বলা যাইতে পারে—ভাইটামিনের অভাব জনিত আপত্তি প্রবল নয়। সাবধানে মাখন গলাইয়া ঘি করিলে ভাইটামিন সমস্তই বজায় থাঁকে। কিন্তু বাজারের ঘি তৈয়ারির সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয় না, গোয়ালা ও আড়তদারের গৃহে বহুবার উন্মুক্ত কটাহে জাল দেওয়া হয়, তাহাতে ভাইটামিন অনেকটা নষ্ট হয়, অবশ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে। হালুইকরের কটাহে যে ঘি দিনের পর দিন উত্তপ্ত করা হয় তাহাতে কিছুমাত্র ভাইটামিন থাকে কিনা সন্দেহ। এবিষয়ে কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা জানি না। মোট কথা, বাড়ির রান্নায় যে ঘি দেওয়া হয় তাহাতে ভাইটামিন থাকিতে পারে কিন্তু বাজারের ঘৃতপক্ক খাবারে না থাকাই সম্ভবপর। ইহাও বিবেচ্য—দেশের অধিকাংশ লোক ঘি খাইতে পায় না, রান্নায় তেলই বেশী চলে, এবং তেলে ভাইটামিন নাই, অন্তত ঘিএ যে ভাইটামিন থাকে তাহা নাই।

কিন্তু অন্য যুক্তি অনাবশ্যক। বিদেশী ঘনীকৃত তৈলের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় যুক্তি—ইহাতে ধর্মহানি হয়। এই ধর্ম গতানুগতিক অন্ধসংস্কার নয়, ভাইটামিনের ধর্মও নয়,—দেশের স্বার্থরক্ষার ধর্ম, আত্মনির্ভরতার ধর্ম। এই ধর্মবুদ্ধির উন্মেষের ফলে ভারতবাসী বুঝিয়াছে যে বিদেশী বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হয় না, বৃদ্ধি পায় মাত্র। ঘি খাইবার পয়সা নাই, কিন্তু কোন্ দুঃখে বিদেশী তৈল খাইব? এদেশের স্বাভাবিক তৈল কি দোষ করিল? সর্ষপ তৈলের ঝাঁজ সব সময় ভাল না লাগে তো অন্য তৈল আছে। প্রাচীন ভারতে 'তৈল' শব্দে তিল তৈলই বুঝাইত, লোকে তাহাতেই রাঁধিত, বোম্বাই মাদ্রাজ মধ্যপ্রদেশে এখনও তাহা চলে। ইহা স্নিগ্ধ, নির্দোষ, সুপচ। বাঙালীর নাক সিটকাইবার কারণ নাই। সর্ষপ তৈলের উগ্র গন্ধ আমরা সহিতে পারি, বাজারের কচুরি গজা খাইবার সময় ঘিএর বিকৃত গন্ধ মনে মনে মার্জনা করি, নির্গন্ধ ভেজিটেব্‌ল প্রডক্ট উত্তপ্ত হইলে দুর্গন্ধ হয় তাহাও জানি, তবে তিল চীনাবাদাম তৈলে অভ্যস্ত হইব না কেন? সাহেবের দেখাদেখি কাঁচা শাকে স্যালাড অয়েল মিশাইয়া খাই, তাহাতে কি গন্ধ নাই? অশ্বত্থামা পিটুলি-গোলা খাইয়া ভাবিয়াছিলেন দুধ, আমরাও একটা নূতন কিছু খাইয়া ভাবিতে চাই ঘি খাইতেছি। এজন্য বিদেশী 'উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ' অনাবশ্যক, লুচি কচুরি ভাজার উপযুক্ত স্বদেশী উদ্‌ভিজ্জ তৈল যথেষ্ট আছে। নিমন্ত্রিত কুটুম্বকে ঠকানো হয়তো একটু শক্ত হইবে, কিন্তু

দেশবাসীর আত্মসম্মান রক্ষা পাইবে। যদি কলিকাতা ও অন্যান্য নগরের মিউনিসিপালিটি চেষ্টা করেন তবে তিলাদি তৈলের প্রচার সহজেই হইতে পারিবে। শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুন্দরীমোহন দাস, রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ভিষক্ মহোদয়গণ প্রবন্ধাদি দ্বারা সাধারণকে এবিষয়ে জ্ঞানদান করিতে পারেন। ময়রা যাহাতে প্রকাশ্যভাবে বিশুদ্ধ তৈলের অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈলের খাবার বেচিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। এইরকম খাবার ঘনীকৃত তৈলের অথবা খারাপ ঘিএর খাবার অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। ঘি খাইব, অভাবে অজ্ঞাত-উপাদান ভেজাল দ্রব্য খাইব—লোকের এই মানসতার পরিবর্তন আবশ্যক। ঘি খাইব, না জুটিলে সজ্ঞানে বিশুদ্ধ তৈল খাইব অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈল খাইব—ইহাই সদ্‌বুদ্ধি।

কয়েকজন বাঙালী রসায়নবিৎ ঘনীকৃত তৈল উৎপাদনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের চেষ্টায় এদেশে ইহার উৎপাদন হয় তবে ধর্মহানির আপত্তি থাকিবে না। যতদিন তাহা না হয় ততদিন ক্ষমতায় কুলাইলে ঘি খাইব, অথবা সর্ষপ তিল চীনাবাদাম বা নারিকেল তৈল খাইব, অথবা ঘৃত ও তৈল মিশাইয়া খাইব, রুচিতে না বাধিলে স্বদেশী চর্বিও খাইব, কিন্তু বিদেশী ঘনীকৃত তৈল পূতনার স্তন্যবৎ পরিহার করিব।

১৩৩৭

# ভাষা ও সংকেত

ভাষা একটা নমনীয় পদার্থ, তাকে টেনে বাঁকিয়ে চট্‌কে আমরা নানা প্রয়োজনে লাগাই। কিন্তু এরকম নরম জিনিসে কোনও পাকা কাজ হয় না, মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটির দরকার, তাই পরিভাষার উদ্‌ভব হয়েছে। পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের সংকোচ নেই প্রসার নেই। আলংকারিকের কথায় বলা যেতে পারে—পরিভাষার অভিধাশক্তি আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা আর লক্ষণার বালাই নেই। পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করলে বিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না।

কিন্তু ভাষা আর পরিভাষাতেও সব সময় কুলয় না, তখন সংকেতের সাহায্য নিতে হয়। যিনি ইমারত গড়েন, তিনি কেবল বর্ণনা দ্বারা তাঁর পরিকল্পনা বোধগম্য করতে পারেন না, তাঁকে নক্‌শা আঁকতে হয়। সে নক্‌শা ছবি নয়, সংকেতের সমষ্টি মাত্র—পুরনো গাঁথনি বোঝাবার জন্য হলদে রং, নূতন গাঁথনি লাল, কংক্রিটে হিজিবিজি, খিলানের জায়গায় ঢেরা-চিহ্ন, ইত্যাদি। বস্তুর সঙ্গে নক্‌শার পরিমাপগত সাম্য আছে, কিন্তু অন্য সাদৃশ্য বিশেষ কিছু নেই। অভিজ্ঞ লোকের কাছে নক্‌শা বস্তুর প্রতিমাস্বরূপ, কিন্তু আনাড়ীর কাছে তা প্রায়

নিরর্থক ; বরং ছবি দেখলে বা বর্ণনা পড়লে সে কতকটা বুঝতে পারে।

গানের স্বরলিপিও সংকেত মাত্র। গান শুনলে যে সুখ, স্বরলিপি-পাঠে তা হয় না, কিন্তু গানের স্বর তাল মান লয় বোঝাবার জন্য স্বরলিপির প্রয়োজন আছে।

একজনের উপলব্ধ বিষয় অন্যজনকে যথাবৎ বোঝাবার সুপ্রয়োজ্য সংক্ষিপ্ত সস্তা উপায়—সংকেত। সংকেতের পূর্ব-নির্দিষ্ট অর্থ যে জানে, তার পক্ষে উদ্দিষ্ট বিষয়ের ধারণা করা অতি সহজ, তাতে ভুলের সম্ভাবনা নেই, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নেই, শুধুই বিষয়ের বোধ। সংকেতের কারবার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত, হৃদয়ের সহিত নয়। অবশ্য, নায়ক-নায়িকার সংকেতের কথা আলাদা।

বিজ্ঞানী বহুপ্রকার সংকেতের উদ্‌ভাবনা করেছেন। তিনি আশা করেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনেক উপলব্ধিই কালক্রমে সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যাবে। একদিন হয়তো গানের স্বরলিপির তুল্য রসলিপি গন্ধলিপি স্পর্শলিপিও উদ্‌ভাবিত হবে, তখন আমরা দ্রাক্ষারসের স্বাদ, চুতমুকুলের গন্ধ, মলয়-সমীরের স্পর্শ ফরমুলা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারব। শারদাকাশ ঠিক কি রকম নীল, সমুদ্রকল্লোলে কোন্ কোন্ ধ্বনি কত মাত্রায় আছে, তাও ছক-কাটা কাগজে আঁকাবাঁকা রেখায় দেখাব। এখন যেমন জুতো কেনবার সময় বলি—৮ নম্বর চাই, ভবিষ্যতে তেমনি সন্দেশ কেনবার সময় বলব—মিষ্টতা ৬,

কাঠিন্য ২। হয়তো সুন্দরীর রংএর ব্যাখ্যান লিখব—দুধ ৩, আলতা ২, কালি ৫। তখন ভাষার অক্ষমতায় বস্তু অপরঞ্জিত হবে না, যা সত্য তাই সাংকেতিক বর্ণনায় অবধারিত হবে।

কবির ব্যবসায় কি উঠে যাবে? তার কোনও লক্ষণ দেখছি না। ভাষার যে উচ্ছৃঙ্খল নমনীয়তা হিসাবী লোককে পদে পদে হয়রান করে, তারই উপর কবির একান্ত নির্ভর। তিনি বিজ্ঞানীর মতন বিশ্লেষণ করেন না, প্রত্যক্ষ বিষয় যথাবৎ বোঝাবার চেষ্টা করেন না। প্রত্যক্ষ ছাড়াও যে অনুভূতি আছে, যা মানুষের সুখদুঃখের মূলীভূত, বিজ্ঞান যার আশেপাশে মাথা ঠুকছে, সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি কবি ভাষার ইন্দ্রজালে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। সর্বথা-নমনীয় নির্বাধ ভাষাই তাঁর প্রকাশের উপাদান, তাতে ইন্দ্রিয়-গম্য ইন্দ্রিয়াতীত সকল সত্যই তিনি ব্যক্ত করতে পারেন। পরিভাষা আর সংকেতে কবির কি হবে? তা ভাবের পিঞ্জর মাত্র।

আদিকবিকে নারদ বলেছেন—

'—সেই সত্য যা রচিবে তুমি ;
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।—'

যাঁরা নিরেট সত্যের কারবারী, তাঁরাও এখন মাথা চুলকে ভাবছেন—হবেও বা।

১৩৩৮

# সাধু ও চলিত ভাষা

কিছুকাল পূর্বে সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল এখন তা বড় একটা শোনা যায় না। যাঁরা সাধু অথবা চলিত ভাষার গোঁড়া, তাঁরা নিজ নিজ নিষ্ঠা বজায় রেখেছেন, কেউ কেউ অপক্ষপাতে দুই রীতিই চালাচ্ছেন। পাঠকমণ্ডলী বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন—বাংলা সাহিত্যের ভাষা পূর্বে এক রকম ছিল, এখন দু রকম হয়েছে।

আমরা শিশুকাল থেকে বিদ্যালয়ে যে বাংলা শিখি তা সাধু বাংলা, সেজন্য তার রীতি সহজেই আমাদের আয়ত্ত হয়। খবরের কাগজে মাসিক পত্রিকায় অধিকাংশ পুস্তকে প্রধানত এই ভাষাই দেখতে পাই। বহুকাল বহুপ্রচারের ফলে সাধু-ভাষা এদেশের সকল অঞ্চলে শিক্ষিতজনের অধিগম্য হয়েছে। কিন্তু চলিতভাষা শেখবার সুযোগ অতি অল্প। এর জন্য বিদ্যালয়ে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না, বহুপ্রচলিত সংবাদ-পত্রাদিতেও এর প্রয়োগ বিরল। এই তথাকথিত চলিতভাষা সমগ্র বঙ্গের প্রচলিত ভাষা নয়, এ ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী-তীরবর্তী কয়েকটি জেলার মৌখিকভাষার কিছু মিল আছে মাত্র। এই কারণে কোনও কোনও অঞ্চলের লোক চলিত-ভাষা সহজে আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে তা দুরূহ।

যোগেশচন্দ্র-প্রবর্তিত দুটি পরিভাষা এই প্রবন্ধে প্রয়োগ

করছি—মৌখিক ও লৈখিক। আমার একটা অযত্নলব্ধ মৌখিক-ভাষা আছে তা রাঢ়ের বা পূর্ববঙ্গের বা অন্য অঞ্চলের। চেষ্টা করলে এই ভাষাকে অল্পাধিক বদলে কলকাতার মৌখিক-ভাষার অনুরূপ ক'রে নিতে পারি, না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার মুখের ভাষা যেমনই হোক, আমাকে একটা লৈখিক বা লেখাপড়ার ভাষা শিখতেই হবে—যা সর্বসম্মত, সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালীর বোধ্য, অর্থাৎ সাহিত্যের উপযুক্ত। এই লৈখিকভাষা 'সাধু' হতে পারে কিংবা 'চলিত' হতে পারে। কিন্তু যদি দুটিই কষ্ট ক'রে শিখতে হয় তবে আমার উপর অনর্থক জুলুম হবে। যদি চলিতভাষাই যোগ্যতর হয় তবে সাধুভাষার লোপ হ'লে হানি কি? সাধুভাষায় রচিত যেসব সদ্‌গ্রন্থ আছে তা নাহয় যত্ন ক'রে তুলে রাখব। কিন্তু যে ভাষা অবাঞ্ছনীয় এখন আর তার বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, যদি সাধুভাষাতেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে এই সুপ্রতিষ্ঠিত বহুবিদিত ভাষার পাশে আবার একটা অনভ্যস্ত ভাষা খাড়া করবার চেষ্টা কেন?

যাঁরা সাধু আর চলিত উভয় ভাষারই ভক্ত তাঁরা বলবেন কোনওটাই ছাড়তে পারি না। সাধুভাষার প্রকাশশক্তি একরকম, চলিতভাষার অন্যরকম। দুই ভাষাই আমাদের চাই, নতুবা সাহিত্য অঙ্গহীন হবে। ভাষার দুই ধারা স্বত স্ফূর্ত হয়েছে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব ক'রে তার একটিকে গলা টিপে মারতে পারি না।

কোনও ব্যক্তি বা বিদ্বৎসংঘের ফরমাশে ভাষার সৃষ্টি স্থিতি লয় হতে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবে ও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে। কিন্তু প্রকৃতির উপরেও মানুষের হাত চলে। সাধারণের উপেক্ষার ফলে যদি একটা বিষয় কালোপযোগী হয়ে গ'ড়ে না ওঠে, তথাপি প্রতিষ্ঠাশালী কয়েকজনের চেষ্টায় অল্পকালেই তার প্রতিকার হতে পারে। অতএব সাধু আর চলিত ভাষার সমস্যায় হাল ছেড়ে দেবার কারণ নেই।

একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে যে চলিতভাষা আর পশ্চিম বঙ্গের মৌখিকভাষা সর্বাংশে সমান। এর ফলে বিস্তর অনর্থক বিতণ্ডা হয়েছে। মৌখিকভাষা যে অঞ্চলেরই হোক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লৈখিকভাষা দেখে অর্থাৎ প'ড়ে বুঝতে হয়। মৌখিকভাষার উচ্চারণই তার সর্বস্ব। লৈখিকভাষার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলে একরকমে না করলেও ক্ষতি নেই, মানে বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষা সর্বসাধারণের ভাষা, সেজন্য বানানে মিল থাকা দরকার, উচ্চারণ যাই হোক।

'ভাষা' শব্দটি আমরা নানা অর্থে প্রয়োগ করি। জাতিবিশেষের কথা ও লেখার সামান্য লক্ষণসমূহের নাম ভাষা, যথা—বাংলা ভাষা। আবার, শব্দাবলীর প্রকার (form)—অর্থাৎ কোন্ শব্দ বা শব্দের কোন্ রূপ প্রয়োজ্য বা বর্জনীয় তার রীতিও ভাষা, যথা—সাধুভাষা। আবার,

প্রকার এক হ'লেও ভঙ্গী(style)র ভেদও ভাষা, যথা—আলালী, বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী ভাষা।

আলালী আর বঙ্কিমী ভাষা যতই ভিন্ন হোক, দুইটিই যে সাধুভাষা তাতে সন্দেহ নেই। ভেদ যা আছে তা প্রকারের নয়, ভঙ্গীর। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা আর রবীন্দ্রনাথের লিপিকার ভাষায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান, কিন্তু দুটিই চলিত-ভাষায় লেখা; প্রকার এক, ভঙ্গী ভিন্ন। আজকাল সাধু ও চলিত ভাষায় যে সাহিত্য রচনা হচ্ছে তার লক্ষণাবলী তুলনা করলে এইসকল ভেদাভেদ দেখা যায়—

(১) দুই ভাষার প্রকারভেদ প্রধানত সর্বনাম আর ক্রিয়ার রূপের জন্য। 'তাঁহারা বলিলেন, তাঁরা বললেন'।

(২) সাধুভাষার কয়েকটি সর্বনাম কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গীয় মৌখিক রূপের কাছাকাছি এসে পড়েছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহারদিগের', তাথেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। এখন অনেকে সাধুভাষাতেও 'তাদের' লিখছেন। ক্রিয়াপদেও মৌখিকের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। 'লিখা, শিখা, শুনা, ঘুরা' স্থানে অনেকে সাধুভাষাতেও 'লেখা, শেখা, শোনা, ঘোরা' লিখছেন।

(৩) সর্বনাম আর ক্রিয়াপদ ছাড়াও কতকগুলি অ-সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দে পার্থক্য দেখা যায়। সাধুতে 'উঠান, উনান, মিছা, কুয়া, সুতা', চলিতে 'উঠন, উনন, মিছে, কুয়ো, সুতো'। কিন্তু এইরকম বহু শব্দের চলিত রূপই এখন সাধুভাষায় স্থান

পেয়েছে। 'আজিকালি, চাউল, একচেটিয়া, লতানিয়া' স্থানে 'আজকাল, চাল, একচেটে, লতানে' চলছে।

(৪) সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ। কিন্তু সাধারণত চলিতভাষায় কিছু কম দেখা যায়। এই প্রভেদ উভয় ভাষার প্রকারগত নয়, লেখকের ভঙ্গীগত, অথবা বিষয়ের লঘুগুরুত্বগত।

(৫) আরবী ফারসী প্রভৃতি বিদেশাগত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ, কিন্তু চলিতভাষায় কিছু বেশী দেখা যায়। এই ভেদও ভঙ্গীগত, প্রকারগত নয়।

(৬) অনেক লেখক কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের মৌখিকরূপ চলিতভাষায় চালাতে ভালবাসেন, যদিও সেসকল শব্দের মূল রূপ চলিতভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। যথা—'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' না লিখে 'সত্যি, মিথ্যে, নতুন, অবিশ্যি'। এও ভঙ্গী মাত্র।

উল্লিখিত লক্ষণগুলি বিচার করলে বোঝা যাবে যে সাধুভাষা অতি ধীরে ধীরে মৌখিক শব্দ গ্রহণ করছে, কিন্তু চলিতভাষা কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে তা আত্মসাৎ করতে চায়। সাধুভাষার এই মন্থর পরিবর্তনের কারণ—তার বহুদিনের নিরূপিত পদ্ধতি। চলিতভাষার যদৃচ্ছা বিস্তারের কারণ— নিরূপিত পদ্ধতির অভাব। একের শৃঙ্খলার ভার এবং অন্যের বিশৃঙ্খলা উভয়ের মিলনের অন্তরায় হয়ে আছে। যদি লৈখিক-ভাষাকে কালোপযোগী লঘু শৃঙ্খলায় নিরূপিত করতে পারা

যায় তবে সাধু ও চলিতের প্রকারভেদ দূর হবে, একই লৈখিক-ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস থেকে লঘুতম সাহিত্য পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে লেখা যেতে পারবে, বিষয়ের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে ভাষার ভঙ্গীর অদলবদল হবে মাত্র।

লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ভঙ্গীগত ভেদ অনিবার্য, কারণ, লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয় কথাবার্তায় ততটা হতে পারে না। কিন্তু দুই ভাষার প্রকারগত ভেদ অস্বাভাবিক। কোনও এক অঞ্চলের মৌখিকভাষার প্রকার আশ্রয় ক'রেই লৈখিকভাষা গড়তে হবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক-ভাষারই যোগ্যতা বেশী, কারণ, এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে।

কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে উদ্যম পণ্ড হবে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও বানান আর উচ্চারণের সংগতি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। 'মতো, ছিলো, কাল, করো' ইত্যাদি কয়েকটি রূপ নাহয় উচ্চারণসূচক (?) করা গেল, কিন্তু আরও শত শত শব্দের গতি কি হবে? বিভিন্ন টাইপের ভারে আমাদের ছাপাখানা নিপীড়িত, তার উপর যদি ও-কারের বাহুল্য আর নূতন নূতন চিহ্ন আসে তবে লেখা আর ছাপার শ্রম বাড়বে মাত্র। 'কাল' অর্থে কল্য বা সময় বা কৃষ্ণ, 'করে' অর্থে does কি having done, তার নির্ধারণ পাঠকের সহজবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল, অর্থবোধ থেকেই উচ্চারণ আসবে—অবশ্য

নিতান্ত আবশ্যক স্থলে বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উচ্চারণের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া অনাবশ্যক। কলকাতার লোক যদি পড়ে 'রমণীর মোন', আর বরিশালবাসী যদি পড়ে 'রোমোণীর মঅন', তাতে সর্বনাশ হবে না, পাঠকের অর্থবোধ হ'লেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষাকে স্থানবিশেষের উচ্চারণের অনুলেখ করা অসম্ভব। লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার রূপ ও প্রকার সংযত নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্বজনীন হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মৌখিকভাষা হতে অল্পাধিক প্রভেদ—অনিবার্য।

মোট কথা, চলিতভাষাই একমাত্র লৈখিকভাষা হতে পারে যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধুভাষার সঙ্গে রফা করা হয়। বহু লেখক যে আধুনিক চলিতভাষাকে দূর থেকে নমস্কার করেন তার কারণ কেবল অনভ্যাসের কুণ্ঠা নয়, তাঁরা এ ভাষার নমুনা দেখে পথহারা হয়ে যান। বিভিন্ন লেখকের মর্জি অনুসারে একই শব্দের বানান বদলায়, একই রূপের বিভক্তি বদলায়, কভু বা বিশেষ্য সর্বনামের আগে অকারণে ক্রিয়াপদ এসে বসে, বাংলা শব্দাবলীর অদ্ভুত সমাস কানে পীড়া দেয়, ইংরেজী ইডিয়মের সজ্জায় মাতৃভাষা চেনা যায় না। সাধুভাষার প্রাচীন গণ্ডি ছেড়ে চলিতভাষায় এলেই অনেক লেখক একটু অসামাল হয়ে পড়েন।

এমন লৈখিকভাষা চাই যাতে প্রচলিত সাধুভাষা আর

মার্জিতজনের মৌখিকভাষা দুইএরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংকোচ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিকভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না। চলিতভাষার লেখকরা একটু অবহিত হ'লেই সর্বগ্রাহ্য সর্বপ্রকাশক লৈখিকভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করবে। বলা বাহুল্য, গল্পাদি লঘু সাহিত্যে পাত্রপাত্রীর মুখে সব রকম ভাষারই স্থান আছে, মায় তোতলামি পর্যন্ত।

এখন আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করি।—

(১) প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অনুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না, তাতে কিছুমাত্র লাভও নেই।

(২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপের বদলে চলিতরূপ গৃহীত হোক।

(৩) অন্যান্য অ-সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হোক। যদি অনভ্যাসের জন্য বাধা হয়, তবে কতকগুলির সাধুরূপ কতকগুলির চলিতরূপ নেওয়া হোক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধুরূপই বজায় থাকুক, যথা—'ওপর, পেছন, পেতল, ভেতর' না লিখে 'উপর, পিছন, পিতল, ভিতর'। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার মৌখিকরূপই নেওয়া হোক, যথা—'কুয়া, মিছা, সুতা, উঠান, পুরানো' স্থানে 'কুয়ো, মিছে, সুতো, উঠন, পুরনো'।

(৪) যে সংস্কৃত শব্দ চলিতভাষায় অচল নয়—অর্থাৎ

বিখ্যাত লেখকগণ যা চলিতভাষায় লিখতে দ্বিধা করেন না, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' প্রভৃতি বজায় থাকুক।

(৫) এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না—এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ সংস্কৃত শব্দে আর সমাসে সাধুভাষার একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে '…হয়ে উঠল' লিখলেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না। দু দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। শুনতে পাই ধুতির সঙ্গে কোট পরতে নেই, পঞ্জাবি পরতে হয়। এইরকম একটা ফ্যাশনের অনুশাসন বাংলা ভাষাকে অভিভূত করেছে। ধারণা দাঁড়িয়েছে—চলিতভাষা একটা তরল পদার্থ, তাতে হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটা যায়, কিন্তু ভারী জিনিস নিয়ে নয়। ভার বইতে হ'লে শক্ত জমি চাই, অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিতভাষাকে বিষয় অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে নবরচিত পাঠ্যপুস্তকে যদি এই ভাষা চলে তবে তা কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাধারণের আয়ত্ত হবে। ব্যাকরণ আর অভিধানে এই ভাষার শব্দাবলীর বিবৃতি দিতে হবে, অবশ্য সাধুভাষাকেও উপেক্ষা করা চলবে না, কারণ, সে ভাষার বহু পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ্য থাকবে। কালক্রমে যখন সাধুভাষা প্রত্ন হয়ে পড়বে তখনও তা স্পেনসার

শেকস্পিয়রের ভাষার তুল্য সমাদরে অধীত হবে। নূতন লৈখিকভাষাও চিরকাল একরকম থাকবে না। শক্তিশালী লেখকগণের প্রভাবে পরিবর্তন আসবেই, এবং কালে কালে যেমন পঞ্জিকাসংস্কার আবশ্যক হয়, তেমনি যোগ্যজনের চেষ্টায় লৈখিক ভাষারও নিয়মসংস্কার আবশ্যক হবে।

১৩৪০

# বাংলা পরিভাষা

অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ—সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গবিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা-স্থানীয়। সাধারণত 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শনবিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।

সাধারণ লোকে কথাবার্তায় চিঠিপত্রে অসংখ্য শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করে, কিন্তু বিদ্যালোচনার জন্য করে না, সেজন্য আমাদের খেয়াল হয় না যে সেসকল শব্দ পারিভাষিক। 'স্বামী, স্ত্রী, গাই, ষাঁড়, বন্ধক, তামাদি, লোহা, তামা, চৌকো, গোল' প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিক খ্যাতি নেই, কারণ এসকল শব্দ অতিপরিচিত। বিলাতে একটা নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হ'ল, আবিষ্কর্তা তার পারিভাষিক নাম দিলেন 'অ্যালুমিনিয়ম'। বহুদিন এই নাম কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণায় আবদ্ধ রইল। এখন অ্যালুমিনিয়মের ছড়াছড়ি, কিন্তু নামের পারিভাষিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। 'প্লাটিনম অ্যালুমিনিয়ম ক্রোমিয়ম' প্রভৃতি নাম বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সৃষ্ট, সেজন্য পরিভাষা রূপে খ্যাত। 'লোহা

তামা সোনা' প্রভৃতি নাম পণ্ডিতাগমের পূর্ববর্তী তাই অখ্যাত। পণ্ডিতগণ যদি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে 'প্লাটিনম অ্যালুমিনিয়ম' প্রভৃতি নামজাদা শব্দের পাশে স্থান দেন, তবে 'লোহা তামা সোনা'ও পরিভাষা রূপে খ্যাত হবে। যে শব্দ সাধারণে আলগা ভাবে প্রয়োগ করে তাও পণ্ডিতগণের নির্দেশে পরিভাষা রূপে গণ্য হতে পারে। সাধারণ প্রয়োগে রুই পুঁটি চিংড়ি তিমি সবই 'মৎস্য'। কিন্তু পণ্ডিতরা যদি যুক্তি ক'রে স্থির করেন যে 'মৎস্য' বললে কেবল বোঝাবে—কান্‌কো-যুক্ত হাত-পা-বিহীন মেরুদণ্ডী অণ্ডজ ( এবং আরও কয়েকটি লক্ষণ যুক্ত ) প্রাণী, তবে 'মৎস্য' নাম পারিভাষিক হবে এবং চিংড়ি তিমিকে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে মৎস্য বলা চলবে না।

বিদ্যাচর্চায় যত পরিভাষা আবশ্যক, সাধারণ কাজে তত নয়। কিন্তু জনসাধারণেও নূতন নূতন বিষয়ের পরিচয় লাভ করছে সেজন্য বহু নূতন পারিভাষিক শব্দ অবিদ্বানেও শিখছে। যে জিনিস সাধারণের কাজে লাগে তার নাম লোকের মুখে মুখেই প্রচারিত হয় এবং সে নাম একবার শিখলে লোকে সহজে ছাড়তে চায় না। পণ্ডিতরা যদি নূতন নাম চালাবার চেষ্টা করেন তবে সাধারণের তরফ থেকে বাধা আসতে পারে। বাংলা পরিভাষা সংকলনকালে এই বাধার কথা মনে রাখা দরকার।

আমাদের দেশে এখনও উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী ভাষা। নিম্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা উচ্চই

হোক আর নিম্নই হোক, মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা সকলে ক্রমশ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষায় প্রয়োগের উপযুক্ত পরিভাষা যতদিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে ততদিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। বাংলা দেশ যদি স্বাধীন হ'ত, রাজভাষা যদি বাংলা হ'ত, বহু নব নব দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি এদেশে আবিষ্কৃত হ'ত, তবে আমাদের পরিভাষা দেশীয় ভাষার বশে স্বচ্ছন্দে গ'ড়ে উঠত এবং বিদ্বান অবিদ্বান নির্বিশেষে সকলেই তা মেনে নিত, যেমন ইংলাণ্ডে হয়েছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা সেরূপ নয়। এদেশে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হয় তা অতি অল্প, যা হয় তার সংবাদ ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সংকলিত হ'লেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী শব্দ। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী একমত হয়ে একটা বাংলা পরিভাষার ফর্দ মেনে নিতে পারেন, এমন প্রতিজ্ঞাও করতে পারেন যে তাঁদের পুস্তকে প্রবন্ধে ভাষণে বিলাতী শব্দ বর্জন করবেন ( অবশ্য চাকরির কাজে তা পারবেন না )। কিন্তু পরিভাষাদ্বারা সূচিত দ্রব্য যদি বিদেশ থেকে আসে এবং সাধারণের ব্যবহারে লাগে, তবে নূতন নাম চালানো কঠিন হবে। বিদেশ থেকে আয়োডিন আসে, প্রেরকের চালানে ঐ নাম লেখা থাকে ; দোকানদার ঐ নামেই বেচে—তাকে 'এতিন' বা 'নীলিন' শেখানো অসম্ভব। তার মারফৎ জনসাধারণেও ইংরেজী নাম শেখে। যাঁরা

মাতৃভাষায় বিদ্যাবিতরণে অগ্রকর্মী হবেন, তাঁদের পক্ষেও দেশী নামে নিষ্ঠা বজায় রাখা শক্ত হবে। তাঁরা বিদ্যা অর্জন করবেন ইংরেজী পরিভাষার সাহায্যে আর প্রচার করবেন বাংলা পরিভাষায়—এই দ্বৈভাষিক অবস্থা সহজ নয়। তাঁদের নানা ক্ষেত্রে স্খলন হবে। যাদের শিক্ষার জন্য দেশী পরিভাষার সৃষ্টি, তারা যদি ইংরেজী নাম ছাড়তে না চায় তবে শিক্ষকও বিদ্রোহী হবেন। বাংলা ভাষায় প্রয়োগযোগ্য পরিভাষা আমাদের অবশ্য চাই, কিন্তু সংকলনকালে ভুললে চলবে না যে ব্যবহারক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রবল প্রতিযোগিতা আছে।

সাধারণে 'আয়োডিন, অক্সিজেন, মোটর, কার্বুরেটর, কলেরা, ভ্যাকসিন' প্রভৃতি শব্দে অভ্যস্ত হয়েছে, এগুলির বাংলা নাম চলবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু কয়েকটি নবরচিত বাংলা শব্দের চলন সহজেই হয়েছে, যথা—'উড়ো-জাহাজ, বেতারবার্তা, আবহসংবাদ'। কতকগুলি বিকট শব্দও চলছে, যেমন 'আইন-অমান্য-আন্দোলন'। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সত্ত্বেও 'বাধ্যতামূলক' প্রবলপ্রতাপে চলছে। এই প্রচলন খবরের কাগজের দ্বারা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রচারে এ সাহায্য মিলবে না। বিভিন্ন লেখকের পুস্তকে প্রবন্ধে যদি একই রকম পরিভাষা গৃহীত হয়, তবে প্রচার অনেকটা সহজ হবে।

এদেশে বহু বৎসর থেকে পরিভাষা সংকলনের চেষ্টা হয়ে আসছে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের দপ্তরে অনেক পরিভাষা

সংগৃহীত হয়েছে, 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় পরিভাষা প্রকাশিত হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে পরিভাষা রচনা করেছেন। এইসকল পরিভাষার প্রায় সমস্তই প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রচলিত শব্দ, অথবা সংকলয়িতার স্বরচিত সংস্কৃত শব্দ। এপর্যন্ত আয়োজন যা হয়েছে তা নিতান্ত কম নয়, কিন্তু ভোক্তা বিরল। তার একটি কারণ—একই ইংরেজী শব্দের নানা প্রতিশব্দ হয়েছে কিন্তু কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তার নির্বাচন হয় নি। সংকলয়িতা নিজের রচনায় তাঁর পছন্দমত শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু সাধারণ লেখক দিশাহারা হয়। আর এক কারণ—সংগ্রহ বৃহৎ হ'লেও অসম্পূর্ণ। সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ—ইংরেজী পরিভাষার বিপুল প্রতিষ্ঠা।

আজকাল বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ যে ভঙ্গীতে লেখা হয় তা লক্ষ্য করলে আমাদের বাধা কোথায় আর সিদ্ধি কোন্ পথে তার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি—

(গ্রামোফোন-রেকর্ড)। 'Masterটি পরিষ্কার করিয়া ইহার উপর Bronze Powder ছড়ান হয়। Powder যাহাতে ইহার প্রত্যেক grooveএর ভিতর উত্তমরূপে প্রবেশ করে তাহা দেখিতে হইবে। পরে Electroplate করিয়া ইহার উপর Copper deposit করা হয়। এই deposit পরিমাপ অনুযায়ী পুরু হইলে ইহাকে master হইতে পৃথক

করা হয়। Masterএর music lines তখন এই Copyর উপর উঠিয়া আসে। এই Copyকে Original বলা হয়।'

লেখক পরিশেষে বলেছেন—'টেক্‌নিক্যাল ডিটেইলস্‌এর মধ্যে যাই নাই'। যান নি তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ইনি ভাষার দৈন্যের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নি, যেমন-তেমন উপায়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। আর একটি নমুনা দিচ্ছি। প্রবন্ধ আমার কাছে নেই, কিন্তু নামটি কণ্ঠস্থ আছে, তা থেকেই রচনার পরিচয় হবে—

'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতীলিনের উপর কুলহরিণের ক্রিয়া।'

এই লেখক তাঁর বক্তব্য বোধগম্য করবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন, বিভীষিকা দেখানোও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ইনি নবলব্ধ পরিভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ কসরৎ করেছেন মাত্র। একজন প্রথিতনামা মনীষীর রচনা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি—

'মণিসমূহের নিয়ত সংস্থান অসংখ্যপ্রকার। কিন্তু তৎসমুদায়কে ছয়টি মূল সংস্থানে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এই ছয় মূল সংস্থানের প্রত্যেকে দ্বিবিধ,—স্তম্ভাকার (prismatic) এবং শিখরাকার (pyramidal)। এইসকল সংস্থান বুঝিবার নিমিত্ত মণির মধ্যে কয়েকটি অক্ষরেখা কল্পিত হইয়া থাকে। কোন নিয়তাকার মণির দুই বিপরীত স্থানকে মনে মনে কোন রেখা দ্বারা যোগ করিলে তাহার অক্ষরেখা

পাওয়া যায়। যথা, দুই বিপরীত কোণ, কিংবা দুই বিপরীত পার্শ্বের মধ্যস্থল, কিংবা দুই বিপরীত ধারের মধ্যস্থল।'

লেখকের বক্তব্য অনধিকারীর পক্ষে কিঞ্চিৎ দুরূহ হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি যে বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল তাতে সন্দেহ নেই। একজন লোকপ্রিয় অধ্যাপকের রচনার নমুনা—

'রুমকর্ফ কয়েল ছাড়া আরও অনেক প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির করা যায়। রঞ্জনরশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে, বা সেই পদার্থ রেডিয়মের ন্যায় কোন ধাতুর নিকট রাখিলে সেই পদার্থ হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয়···বেশী কিছু নয়, কোন পদার্থ একটু বেশী উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে ইলেকট্রন নির্গত হইতে থাকে।'

এই লেখক ইংরেজী শব্দ নির্ভয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তথাপি মাতৃভাষার জাতিনাশ করেন নি।

বাংলা ভাষার উপযুক্ত পরিভাষা সংকলন একটি বিরাট কাজ, তার জন্য অনেক লোকের চেষ্টা আবশ্যক। কিন্তু এই চেষ্টা সংঘবদ্ধ ভাবে একই নিয়ম অনুসারে করা উচিত, নতুবা পরিভাষার সামঞ্জস্য থাকবে না। প্রথম কর্তব্য—সমস্ত বিষয়টিকে ব্যাপক দৃষ্টিতে নানা দিক থেকে দেখা, তাতে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজন সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে, উপায় স্থির করাও হয়তো সহজ হবে। এই প্রবন্ধে কেবল সেই দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করব।

সকল বিদ্যার পরিভাষাকেই মোটামুটি এই কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—

বিশেষ (individual)। যথা—সূর্য, বুধ, হিমালয়।

দ্রব্য (বস্তু, substance; অথবা সামগ্রী, article)। যথা—কাষ্ঠ, লৌহ, জল; দীপ, চক্র, অরণ্য।

বর্গ (class)। যথা—ধাতু, নক্ষত্র, জীব, স্তন্যপায়ী।

ভাব (abstract idea)। যথা—গতি, সংখ্যা, নীলত্ব, স্মৃতি।

বিশেষণ (adjective)। যথা—তরল, মিষ্ট, আকৃষ্ট।

ক্রিয়া (verb)। যথা—চলা, ঠেলা, ওড়া, ভাসা।

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র স্পষ্ট নয়। কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ অনুসারে দ্রব্য বর্গ বা বিশেষণ বাচক হতে পারে। কতকগুলি শব্দ দ্রব্যবাচক কি ভাববাচক তা স্থির করা কঠিন, যেমন—দেশ, কাল, আলোক, কেন্দ্র।

দেখা যায় যে এক এক শ্রেণীর শব্দ কোনও বিদ্যায় বেশী দরকার কোনও বিদ্যায় কম দরকার। জ্যোতিষে ও ভূগোলে বিশেষবাচক শব্দ অনেক চাই, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যায় খুব কম, অথবা অনাবশ্যক। দ্রব্যবাচক শব্দ রসায়নে অত্যন্ত বেশী, জীববিদ্যায় (botany zoology anatomy ইত্যাদিতে) কিছু কম, মণিকবিদ্যায় (mineralogy) আর একটু কম, পদার্থবিদ্যা (physics) ও ভূবিদ্যায় (geology) আরও কম, দর্শন ও মনোবিদ্যায় প্রায় নেই, গণিতে মোটেই নেই। বর্গবাচক শব্দ

জীববিদ্যায় খুব বেশী, রসায়ন ও মণিকবিদ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, অন্যান্য বিদ্যায় আরও কম। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়া-বাচক শব্দ সকল বিদ্যাতেই প্রায় সমান। সকল বিদ্যার পরিভাষা যদি একযোগে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে মোটের উপর দ্রব্যবাচক শব্দ সবচেয়ে বেশী, তার পর যথাক্রমে বর্গবাচক, ভাব-বিশেষণ-ক্রিয়া-বাচক এবং বিশেষ-বাচক শব্দ।

ইংরেজী পরিভাষার ফর্দ সম্মুখে রেখেই সংকলয়িতাকে কাজ করতে হবে, অতএব ইংরেজী পরিভাষার স্বরূপ বিচার করা কর্তব্য, তাতে উপায়ের সন্ধান মিলতে পারে। ইংরেজী পরিভাষা জাতি (origin) অনুসারে এইরূপে ভাগ করা যেতে পারে—

a. সাধারণ ইংরেজী শব্দ। যথা—iron, solid।

b. প্রচলিত অন্য ভাষার শব্দ। যথা—lesion, canyon, breccia, typhoon, totem।

c. গ্রীক লাটিন ( আরবী সংস্কৃত বিরল ) প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার শব্দ বা তার যৌগিক রূপ অথবা অপভ্রংশ। যথা—atom, spectrum, alcohol, ferrous, vertebrate।

d. কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত গ্রীক লাটিন বা অন্য শব্দ। যথা—glycerine, methanol, aniline, farad।

কিন্তু জনসাধারণকে বশে

অবাধে চলে। কিন্তু যেখানে

আবশ্যক, সেখানে a শব্দ প্রায় চলে না, তৎস্থানে

হয় এবং b কিছু কিছু চলে। যথা—iron implements, iron salts, spirit of wine, knee-cap, shedding of leaves; অথচ ferrous (বা ferric) sulphate, alcohol metabolism, patellar fracture, deciduous leaves।

বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সংকলনকালে নিম্নলিখিত উপাদানের যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে—

ক। সাধারণ বাংলা শব্দ।

খ। হিন্দী-উর্দু ফারসী আরবী শব্দ।

গ। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ (পূর্ববর্ণিত a b c d)।

ঘ। প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ।

ঙ। মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্নজাতীয় শব্দ।

পরিভাষা যদিও মুখ্যত বাঙালীর জন্য সংকলিত হবে, তথাপি অধিকাংশ শব্দ যাতে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর (বিশেষত হিন্দী উড়িয়া মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষীর) গ্রহণযোগ্য বা সহজবোধ্য হয় সে চেষ্টা করা উচিত। তাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভাববিনিময়ের সুবিধা হবে। পূর্বোক্ত c d

শব্দাবলী সকল ইউরোপীয় ভাষায় চলে। ভারতের পক্ষে গ ঘ এর সেইরূপ উপযোগিতা আছে।

আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে গ্রীক লাটিনের যে সম্বন্ধ, তার চেয়ে বাংলা হিন্দী প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ অনেক বেশী। সেজন্য এদেশে সংস্কৃত পরিভাষা (ঘ) সহজেই মর্যাদা পাবে। ইংরেজী পরিভাষার (গ) উপযোগিতাও কম নয়, তার কারণ পরে বলছি। এই দুই জাতীয় পরিভাষার পরেই সাধারণ বাংলা শব্দের (ক) স্থান। এরকম শব্দ সাধারণ বিবৃতিতে অবাধে চলবে, যেমন ইংরেজীতে a চলে। তার পরে খ-এর, বিশেষত হিন্দী-উর্দু শব্দের স্থান; কারণ, হিন্দী-উর্দু সুসমৃদ্ধ ভাষা, বাংলার প্রতিবেশী, এবং ভারতের বহু অঞ্চলে বোধ্য। বাংলায় ফারসী আরবী শব্দ অনেক আছে। যদি উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় তবে আরও কিছু ফারসী আরবী আত্মসাৎ করলে হানি নেই। পরিশেষে মিশ্র শব্দের (ঙ) স্থান। এরূপ শব্দ কিছু কিছু দরকার হবে। যদি 'focus' বাংলায় নেওয়া হয়, তবে focussed = ফোকসিত, long-focus = দীর্ঘফোকস।

বাংলা পরিভাষা সংকলনের সময় ইংরেজী শব্দের প্রতিযোগিতা মনে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র বাধ্য হয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে দেশী পরিভাষা শিখবে। যিনি বিদ্যালয়ের শাসনে নেই অথচ বিদ্যাচর্চা করতে চান, তাঁর যদি মাতৃভাষায় অনুরাগ থাকে তবে তিনি কিছু কষ্ট স্বীকার ক'রেও

দেশী পরিভাষা আয়ত্ত করবেন। কিন্তু জনসাধারণকে বশে আনা সহজ নয়। বিদ্যা মাত্রের যে অঙ্গ তত্ত্বীয় (theoretical), তার সঙ্গে সাধারণের বিশেষ যোগ নেই। বিদ্যার যে অঙ্গ ব্যাবহারিক (applied), সাধারণে তার অল্পাধিক খবর রাখে। তত্ত্বীয় অঙ্গে দেশী পরিভাষার প্রচলন অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ জনসাধারণের রুচির বশে চলতে হয় না। কিন্তু ব্যাবহারিক অঙ্গের সহিত বিদেশী দ্রব্য ও বিদেশী শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাধারণ লোকে পথে হাটে বাজারে কর্মস্থানে যে বিদেশী শব্দ শিখবে তাই চালাবে, এর উদাহরণ পূর্বে দিয়েছি। এই বাধা লঙ্ঘন করা চলবে না, ব্যাবহারিক অঙ্গে বহু পরিমাণে বিদেশী শব্দ মেনে নিতে হবে।

মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষাসংকলন পণ্ড হবে। পরিভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য— বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য ভাষার প্রকাশ-শক্তি বর্ধন। পরিভাষা যাতে অল্পায়াসে অধিগম্য হয় তাও দেখতে হবে। এনিমিত্ত রাশি রাশি বৈদেশিক শব্দ আত্মসাৎ করলেও মাতৃভাষার গৌরবহানি হবে না। বহু বৎসর পূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন—

'মহৈশ্বর্যশালিনী আর্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্যদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে যেসকল

বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষা ঋণস্বীকারে কাতর হয় নাই।...আমাদের পক্ষে সেইরূপ ঋণগ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।' (সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩০১)

বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হতে পারেন, কিন্তু গ্রীক ফারসী আরবী পোর্তুগিজ ইংরেজীও আমাদের ভাষাকে স্তন্যদানে পুষ্ট করেছে। যদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচন ক'রে আরও বিদেশী শব্দ আমরা গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি—'ওয়াইফের টেম্পারটা বড়ই ফ্রেট্‌ফুল হয়েছে', তবে ভাষাজননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি—'মোটরের ম্যাগ্‌নেটোটা বেশ ফিনকি দিচ্ছে', তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষাজননী নিশ্চিন্ত হবেন।

ইউরোপ আমেরিকায় যে International Scientific Nomenclature সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার দ্বারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী অনায়াসে জ্ঞানের আদানপ্রদান করতে পারছেন। এই পরিভাষা একবারে বর্জন করলে আমাদের 'অহম্মুখতা'ই প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, অনেকটা আমরা নিতে পারি। যে বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংলা বানান মূলানুযায়ী করাই উচিত। বিকৃত ক'রে

মোলায়েম করা অনাবশ্যক ও প্রমাদজনক। এককালে এদেশে ইতর ভদ্র সকলেই ইংরেজীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন, তখন general থেকে 'জাঁদরেল', hospital থেকে 'হাসপাতাল' হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে যুগ নেই, বহুকাল ইংরেজী প'ড়ে আমাদের জিবের জড়তা অনেকটা ঘুচেছে। সংস্কৃত শব্দেও কটমটির অভাব নেই। কেউ যদি ভুল উচ্চারণ ক'রে 'যাচ্ঞা'কে 'যাচিঙ্গা', 'জনৈক'কে 'জৈনিক', 'মোটর'কে 'মটোর', 'গ্লিসারিন'কে 'গিল্ছেরিন' বলে, তাতে ক্ষতি হবে না—যদি বানান ঠিক থাকে।

এখন সংকলনের উপায়চিন্তা করা যেতে পারে। আমাদের উপকরণ—এক দিকে দেশী শব্দ, অর্থাৎ বাংলা সংস্কৃত হিন্দী ইত্যাদি; অন্য দিকে ইংরেজী শব্দ। কোথায় কোন্ শব্দ গ্রহণযোগ্য? ধরাবাঁধা বিধান দেওয়া অসম্ভব। মোটামুটি পথনির্ণয়ের চেষ্টা করব।

১। আমাদের দেশে বহুকাল থেকে কতকগুলি বিদ্যার চর্চা আছে, যথা—দর্শন, মনোবিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি। এইসকল বিদ্যার বহু পরিভাষা এখনও প্রচলিত আছে। শাস্ত্র অনুসন্ধান করলে আরও পাওয়া যাবে এবং সেই উদ্ধারকার্য অনেকে করেছেন। এই সমস্ত শব্দ আমাদের সহজেই গ্রহণীয়। এই শব্দসম্ভারের সঙ্গে আরও অনেক নবরচিত সংস্কৃত শব্দ অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গণিতে যোগ বিয়োগ গুণ

ভাগ বর্গ ঘাত (power) প্রভৃতি প্রাচীন শব্দের সঙ্গে নবরচিত কলন (calculus), অবঘাতন (evolution), উদ্‌ঘাতন (involution) সহজেই চলবে। বর্তমান কালে এইসকল বিদ্যার বৃদ্ধির ফলে বহু নূতন পরিভাষা ইউরোপে সৃষ্টি হয়েছে। তার অনেকগুলির দেশী প্রতিশব্দ রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ অত্যন্ত রূঢ় (যেমন focus, thyroid) তা যথাবৎ বাংলা বানানে নেওয়াই উচিত।

২। কতকগুলি বিদ্যা আধুনিক, অর্থাৎ পূর্বে এদেশে অল্পাধিক চর্চিত হ'লেও এখন একবারে নূতন রূপ পেয়েছে, যথা—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, মণিকবিদ্যা, জীববিদ্যা। এইসকল বিদ্যার জন্য অসংখ্য পরিভাষা আবশ্যক। যে শব্দ আমাদের আছে তা রাখতে হবে, বহু সংস্কৃত শব্দ নূতন ক'রে গড়তে হবে, পাওয়া গেলে কিছু কিছু হিন্দী ইত্যাদি ভাষা থেকেও নিতে হবে; অধিকন্তু, ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ রাশি রাশি আত্মসাৎ করতে হবে।

৩। বিশেষবাচক শব্দ আমাদের যা আছে তা থাকবে, যেমন—'চন্দ্র, সূর্য, বুধ, হিমালয়, ভারত, পারস্য'। যে নাম অর্বাচীন কিন্তু বহুপ্রচলিত, তাও থাকবে, যেমন—'প্রশান্ত-মহাসাগর'। কিন্তু অবশিষ্ট শব্দের ইংরেজী নামই গ্রহণীয়, যথা—'নেপচুন, আফ্রিকা, আটলান্টিক'।

৪। দ্রব্যবাচক শব্দের যদি দেশী নাম থাকে, তো রাখব,

যেমন—'স্বর্ণ লৌহ' বা 'সোনা লোহা'। যদি না থাকে তবে প্রচুর ইংরেজী নাম নেব। বৈজ্ঞানিক বস্তু যে নামে পরিচিত, সেই নামই বহু পরিমাণে আমাদের মেনে নিতে হবে। রাসায়নিক ও খনিজ বস্তু এবং যন্ত্রাদি (যথা—মোটর, এঞ্জিন, পাম্প, স্কেল, লেন্স, থার্মমিটার, স্টেথস্কোপ) সম্বন্ধে এই কথা খাটে। রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের তালিকায় স্বর্ণ লৌহ গন্ধক প্রভৃতি নামের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন ক্লোরিন সোডিয়ম থাকবে। ফরমুলা লিখতে ইংরেজী বর্ণই লিখব, ইংরেজী বর্ণমালা আমাদের অপরিচিত নয়। সাধারণত লিখব—'লৌহ কঠিন, পারদ তরল। লেখবার কালি তৈয়ার করতে হিরাকস লাগে'। কিন্তু দরকার হ'লেই নির্ভয়ে লিখব—'ফেরস সালফেট, অর্থোডাইক্লোরোবেনজিন, ম্যাগনেসাইট, রুমকর্ফ্ কয়েল, ইলেকট্রন'। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা রচনায় আশ্চর্য কৌশল দেখিয়েছেন। কিন্তু সে পরিভাষা কল্পান্তেও চলবে না। 'অ্যান্টিমনি থায়োফস্ফেট'এর চেয়ে মণীন্দ্রবাবুর 'অন্তমনসশুল্বভাস্ফেত' কিছুমাত্র শ্রুতিমধুর বা সুবোধ্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন--'ভাষা মূলে সংকেতমাত্র'। আমরা বিদেশী পারিভাষিক শব্দকে রূঢ়-অর্থ-বাচক সংকেত হিসাবেই গ্রহণ করব এবং তার প্রয়োগবিধি শিখব। যাঁর কৌতূহল হবে তিনি 'অক্সিজেন, অ্যান্টিমনি' প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি খোঁজ করবেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে রূঢ় অর্থের জ্ঞানই যথেষ্ট। জীববিদ্যাতেও

ঐ নিয়ম। 'কাষ্ঠ, অস্থি, পুষ্প, অণ্ড' চলবে; 'প্রোটোপ্লাজম, হিমোগ্লোবিন, ভাইটামিন' মেনে নিতে হবে।

৫। বর্গবাচক শব্দের প্রাচীন বা নবরচিত দেশী নাম সহজে চলবে, যথা—'ধাতু, ক্ষার, অম্ল, লবণ, প্রাণী, মেরুদণ্ডী, তৃণ'। কিন্তু যেখানেই শব্দ রচনা কঠিন হবে সেখানে বিনা দ্বিধায় ইংরেজী নাম নেওয়া উচিত। বোধ হয় বর্গের উচ্চতর অঙ্গে (element, compound, phylum, order, genus, species, endogen) দেশী নাম অনায়াসে চলবে। কিন্তু নিম্নতর অঙ্গে বহুস্থলে ইংরেজী নাম মেনে নিতে হবে, যেমন—'হাইড্রোকার্বন, অক্সাইড, গোরিলা, হাইড্রা, ব্যাকটিরিয়া'।

৬। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক শব্দের অধিকাংশই দেশী হতে পারবে। Survival, symbiosis, reflection, polarization, density, gaseous, octahedral, decompose, effervesce প্রভৃতির দেশী প্রতিশব্দ সহজে চলবে। কিন্তু রূঢ় শব্দ ইংরেজীই নিতে হবে, যথা—'গ্রাম, মিটার, মাইক্রন, ফারাড'।

বহুস্থলে একটি ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কিত (cognate) আরও কয়েকটি শব্দ নিতে হবে। 'ফোকস, ফিনল, অক্সাইড, মিটার'এর সঙ্গে 'ফোকাল, ফিনলিক, অক্সিডেশন, মেট্রিক' চলবে। ছাপাখানার ভাষায় যেমন 'কম্পোজ করা' চলেছে, রাসায়নিক ভাষায় তেমনি 'অক্সিডাইজ' করা চলবে।

৭। বাংলায় ( বা সংস্কৃতে ) কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে যার ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই, যথা—শুক্লপক্ষ, পতঙ্গ (winged insect), উদ্‌বৃত্ত (circle cutting equinoctial at right angles), ছায়া (both shadow and transmitted light), উপাঙ্গ (limb of a limb)। পরিভাষার তালিকায় এইসকল শব্দকে সযত্নে স্থান দিতে হবে।

৮। দেশী পরিভাষা নির্বাচনকালে সর্বত্র ইংরেজী শব্দের অভিধা (range of meaning) যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। যদি স্থলবিশেষে দেশী শব্দের অর্থের অপেক্ষাকৃত প্রসার বা সংকোচ থাকে তবে ক্ষতি হবে না—যদি সংজ্ঞার্থ (definition) ঠিক থাকে। প্রসার, যথা—অঙ্গুলি = finger; toe। সংকোচ, যথা—fluid = তরল; বায়ব।

৯। বিভিন্ন বিদ্যায় প্রয়োগকালে একই শব্দের অল্পাধিক অর্থভেদ হয় এমন উদাহরণ ইংরেজীতে অনেক আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় একাধিক পরিভাষা প্রয়োগ করাই ভাল; কারণ, বাংলা আর ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি সমান নয়। যথা—sensitive (mind, balance, photographic plate)। Sensitive শব্দের সমান ব্যঞ্জনা (connotation) বিশিষ্ট বাংলা শব্দ রচনার কোনও প্রয়োজন নেই, একাধিক শব্দ প্রয়োগ করাই ভাল। পক্ষান্তরে এমন বাংলা শব্দও আছে যার সমান ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট ইংরেজী শব্দ নেই, যেমন—

'বিন্দু'=drop ; point ; spot। এস্থলেও ইংরেজীর বশে একাধিক শব্দ রচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ্য বা গৌণ ভাবে চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছে আর একটি নিবেদন জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। সংকলনের ভার যাঁদের উপর, তাঁদের কিরকম যোগ্যতা থাকা দরকার? বলা বাহুল্য, এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বহু লোক চাই। তাঁদের মৌলিক গবেষণার খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সমিতি সংকলন করবেন, তাঁদের মধ্যে দু-চার জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী-উর্দু পরিভাষার খবর রাখেন। যদি কোনও হিন্দীভাষী বিজ্ঞান-সাহিত্য-সেবী সমিতিতে থাকেন তবে আরও ভাল হয়। সর্বোপরি আবশ্যক এমন লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রয়োজ্যতা বিচার করতে পারেন, বিশেষত সংকলিত সংস্কৃত শব্দের। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের আহ্বানে যাঁরা পরিভাষা সংকলন করেছেন তাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত এবং অনেকে একাধিক বিদ্যায় পারদর্শী। তথাপি বিভিন্ন সংকলয়িতার নৈপুণ্যের তারতম্য বহুস্থলে সুস্পষ্ট। Columnar, vetreous, adamantineএর প্রতিশব্দ একজন করেছেন—'স্তম্ভনিভ, কাচনিভ, হীরকনিভ'। আর একজন করেছেন—'স্তাম্ভিক, কাচিক, হৈরিক'। শেষোক্ত শব্দগুলিই যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তাবিত

শব্দের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য তার বিচারের ভার সাধারণের উপর দিলে চলবে না; সংকলন-সমিতিকেই তা করতে হবে। এনিমিত্ত যে বৈদগ্ধ আবশ্যক তা সমিতির প্রত্যেক সদস্যের না থাকতে পারে, কিন্তু কয়েক জনের থাকা সম্ভব। অতএব, পরিভাষাসংকলন বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হ'লেও শেষ নির্বাচন মিলিত সমিতিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৩৪০

# সাহিত্যবিচার

মানুষের মন একটি আশ্চর্য যন্ত্র। কোন্ আঘাতে এ যন্ত্র কিরকম সাড়া দেয় তা আমরা অল্পই জানি। রাম একটি কড়া কথা বললে, অমনি শ্যাম খেপে উঠল; রাম একটু প্রশংসা করলে, শ্যাম খুশী হয়ে গেল। মনের এইরকম সহজ প্রতিক্রিয়া আমরা মোটামুটি বুঝি এবং তার নিয়মও কিছু কিছু বলতে পারি। কিন্তু রাম যদি ব্যক্তি বা দল বিশেষকে উদ্দেশ না ক'রে কিছু লেখে বা বলে, অর্থাৎ কবিতা গল্প প্রবন্ধ রচনা করে বা বক্তৃতা দেয়, তবে তাতে কোন্ কোন্ গুণ থাকলে সাধারণে খুশী হবে তা নির্ণয় করা সোজা নয়। পাঠক বা শ্রোতা যদি সাধারণ না হয়ে অসাধারণ হন, যদি তিনি সমঝদার রসজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তাঁর বিচারপদ্ধতি কিরূপ তা বোঝা আরও কঠিন।

একটা সোজা উপমা দিচ্ছি। চা আমরা অনেকেই খাই এবং তার স্বাদ গন্ধ মোটামুটি বিচার করতে পারি। কিন্তু চা-বাগানের কর্তারা চাএর দাম স্থির করেন কোন্ উপায়ে? এখনও এমন যন্ত্র তৈয়ারী হয় নি যাতে চায়ের স্বাদ গন্ধ মাপা যায়। অগত্যা বিশেষজ্ঞের শরণ নিতে হয়। এই বিশেষজ্ঞ বিশেষ কিছুই জানেন না। এঁর সম্বল শুধু জিব আর নাক। ইনি গরম জলে চা ভিজিয়ে সেই জল একটু চেখে বলেন—

এই চা দু-টাকা পাউণ্ড, এটা পাঁচ সিকে, এটা এক টাকা তিন আনা। তিনি কোন্ উপায়ে এইরকম বিচার করেন তা নিজেই বলতে পারেন না। তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতি অল্প ইতরবিশেষও তাঁর কাছে ধরা পড়ে। এই বিধিদত্ত ক্ষমতার খ্যাতিতে তিনি টি-টেস্টারের পদ লাভ করেন এবং চা-ব্যবসায়ী তাঁর যাচাইকেই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নেয়। তিনি যদি বলেন এই চাএর চেয়ে ঐ চা ঈষৎ ভাল, তবে দু-দশ জন সাধারণ লোক হয়তো অন্য মত দিতে পারে। কিন্তু বহু শত বিলাসী লোক যদি ঐ দুই চা খেয়ে দেখে তবে অধিকাংশের অভিমত টি-টেস্টারের অনুবর্তী হবে।

যাঁরা সাহিত্যে বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি লাভ করেন তাঁরা টি-টেস্টারের সহিত তুলনীয়। টি-টেস্টারের লক্ষণ—স্বাদ-গন্ধের সূক্ষ্ম বোধ আর অসংখ্য পেয়ালার সঙ্গে পরিচয়। বিদগ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ—সূক্ষ্ম রসবোধ আর সাহিত্যে বিপুল অভিজ্ঞতা। স্বাদ গন্ধ কাকে বলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমরা কেবল মনে মনে বুঝি। কিন্তু রসের স্বরূপ সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করাও শক্ত। সাহিত্য-বিচারককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—আপনি কি কি গুণের জন্য এই রচনাটিকে ভাল বলছেন—তবে তিনি কিছুই স্পষ্ট ক'রে বলতে পারবেন না। যদি বলতে পারতেন তবে রসবিচারের একটা পদ্ধতি খাড়া হতে পারত। তাঁর যদি বিদ্যা জাহির করবার লোভ থাকে (থাকতেও পারে, কারণ, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং সব ক্ষেত্রে নয়),

তবে তিনি হয়তো আর্টের উপর বক্তৃতা দেবেন, অলংকারশাস্ত্র উদ্‌ঘাটন করবেন, রসের বিশ্লেষণ করবেন। সেই ব্যাখ্যান শুনে হয়তো শ্রোতা অনেক নূতন জিনিস শিখবে। কিন্তু রসবিচারের মাপকাঠির সন্ধান পাবে না।

সাহিত্যের যে রস তা বহু উপাদানের জটিল সমন্বয়ে উৎপন্ন। সংগীতের রস বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সরল। আমরা লোকপরম্পরায় জেনে এসেছি যে অমুক স্বরের সঙ্গে অমুক স্বর মিষ্ট বা কটু শোনায়, কিন্তু কিজন্য এমন হয় তা ঠিক জানি না। বিজ্ঞানী এইটুকু আবিষ্কার করেছেন যে আমাদের কানের ভিতরের শ্রুতিযন্ত্রে কতকগুলি তন্তু আছে, তাদের কম্পনের রীতি বিভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট। বিবাদী স্বরের আঘাতে এই তন্তুগুলির স্বচ্ছন্দ স্পন্দনে ব্যাঘাত হয়, কিন্তু সংবাদী স্বরে হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের রহস্য যদি আরও জানা যায় তবে হয়তো সংগীতের অনেক তত্ত্ব বোধগম্য হবে। যত দিন তা না হয় তত দিন সংগীতবিদ্যাকে কলা বা আর্ট বলা চলবে কিন্তু বিজ্ঞান বলা চলবে না।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অস্পষ্ট। সুললিত বর্ণনার মায়াজালে এই অজ্ঞতা ঢাকা পড়ে না। কেউ বলেন—art for art's sake, কেউ বলেন—মানুষের কল্যাণই সাহিত্যের কাম্য, কেউ বলেন—সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসাধন। এই সমস্ত ঝাপসা কথায় রসতত্ত্বে নিদান পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু বুঝি যে

সাহিত্যরসে মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু রসের বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা ও যোজনার বিষয় আমরা কিছুই জানি না। যে যে উপাদান সাহিত্যরসের উপজীব্য, তার কয়েকটির সম্বন্ধে আমরা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের রুচিকর বিষয় বর্ণন, চিরাগত সংস্কার ও অভ্যাসের আনুকূল্য, মানুষের প্রচ্ছন্ন কামনার তর্পণ, অপ্রিয় বাধার খণ্ডন, অস্ফুট অনুভূতির পরিস্ফুটন, জ্ঞানের বর্ধন, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি। এইসকল উপাদানের কতকগুলি পরস্পরবিরোধী কতকগুলি নীতিবিরোধী। কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। ওস্তাদ পাচক যেমন কটু অম্ল মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে বিবিধ সুখাদ্য তৈয়ার করে, ওস্তাদ সাহিত্যিকও সেই রকম করেন। খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লঙ্কা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটুকু রসুন দিলে বিকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে কতটুকু শান্তরস বা বীভৎসরস, তত্ত্বকথা বা দুর্নীতি বরদাস্ত হবে, এসবের নির্ধারণ একই পদ্ধতিতে হয়। কয়েকজন ভোক্তার হয়তো বিশেষ বিশেষ রসে অনুরক্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পছন্দই জগতে চরম ব'লে গণ্য হয় না। যিনি কেবল দলবিশেষের তৃপ্তিবিধান করেন অথবা কেবল সাধারণ ভোক্তার অভ্যস্ত ভোজ্য প্রস্তুত করেন, তিনি সামান্য পেশাদার মাত্র। যিনি অসংখ্য খোশখোরাকীর রুচিকে নিজের অভিনব রুচির অনুগত করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা।

এবং যিনি অন্যের রচনায় এই প্রভাব স্বয়ং উপলব্ধি ক'রে সাধারণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই সমালোচক হবার যোগ্য।

তামাক একটা বিষ, কিন্তু ধূমপান অসংখ্য লোকে করে এবং সমাজ তাতে আপত্তি করে না। কারণ, মোটের উপর তামাকে যতটা স্বাস্থ্যহানি হয় তার তুলনায় লোকে মজা পায় ঢের বেশী। পাশ্চাত্ত্য দেশে মদ সম্বন্ধেও এই ধারণা, এবং অনেক সমাজে পরিমিত ব্যভিচারও উপভোগ্য ও ক্ষমার্হ গণ্য হয়। মজা পাওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু তাতে যদি বেশী স্বাস্থ্যহানি ঘটে তবে মজা নষ্ট হয় এবং রসের উদ্দেশ্যই বিফল হয়। সাহিত্যরসের উপাদান বিচারকালে সুধীজন এবিষয়ে স্বভাবত অবহিত থাকেন। যিনি উত্তম বোদ্ধা বা সমালোচক তিনি মজা ও স্বাস্থ্য উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে রসের যাচাই করেন। তাঁর যাচাইএর নিক্তি আর কষ্টিপাথর কিরকম তা তিনি অপরকে বোঝাতে পারেন না, নিজেও বোঝেন না। তথাপি তাঁর সিদ্ধান্তে বড় একটা ভুল হয় না, অর্থাৎ শিক্ষিতজন সাধারণত তাঁর মতেই মত দেয়।

১৩৪১